ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বণ্টন

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

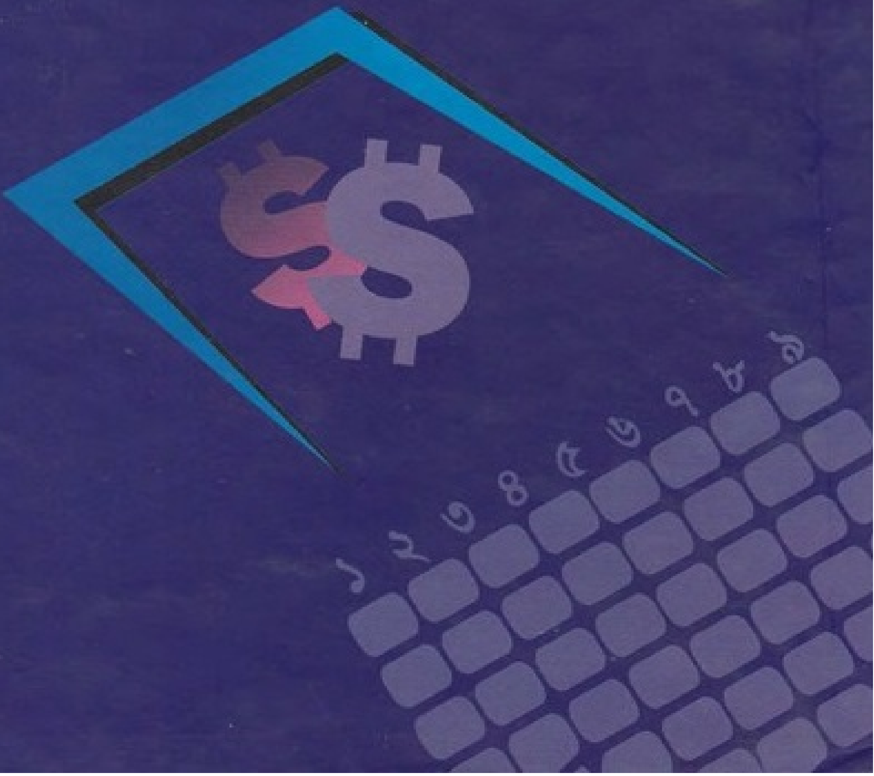

ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বণ্টন

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

আহসান পাবলিকেশন
ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বন্টন

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

ISBN : 984-70012-0003-6

প্রকাশনায়

আহসান পাবলিকেশন

❑ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, ফোন-৯৬৭০৬৮৬, ০১৮১৫৪২২৪১৯

❑ ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৯৩৭৪৮০

❑ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা, ফোন : ৮৩৫৩১২৭, ০১৭১৪২০৭৮৩৯

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০৭

জিলক্বদ, ১৪২৮

অগ্রহায়ণ, ১৪১৪

প্রচ্ছদ :

মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন

কম্পোজ

র‍্যাক্স কম্পিউটার

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

ISLAME SAMPAD ORJAN BAY O BONTON by **Muhammad Nurul Islam**, Publised by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus. Dhaka-1000, First Edition Decembar 2007 Price Tk. 70.00 only. (U.S.$ 2.00)

AP-53

www.pathagar.com

ভূমিকা

সম্পদ অর্জন, ব্যয়-বণ্টন বিষয়ে একটি গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে 'ইসলামে সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বণ্টন' প্রকাশিত হলো। এজন্যে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

সম্পদ অর্জন, আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যয়-বণ্টনের উপরই নির্ভর করে একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের জনগণের কর্মসংস্থান, বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে রাষ্ট্রে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। রাষ্ট্রে কি ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার উপরও নির্ভর করে আয়-উপার্জনে কি প্রক্রিয়া অবলম্বিত হবে এবং আয় ও সম্পদ বণ্টন সুষ্ঠু হবে না বৈষম্যপূর্ণ হবে। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তি সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা ভোগ করে। হালাল-হারামের প্রসংগ এবং পরকালে জবাবদিহিতার বিষয়টি যেহেতু পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি নয়– সেহেতু অর্থনীতিতে মানুষ নানা কৌশলে, সাধারণতঃ অসৎ ও অবৈধ উপায়ে আয় উপার্জনের চেষ্টা করে।

অপরদিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র বা কমাণ্ড-অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানার সীমারেখা সংকুচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। কমিউনিষ্ট দেশসমূহে আয় ও সম্পদ বণ্টন পুরোপুরি কমিউনিষ্ট পার্টি ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল।

ইসলাম এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি রয়েছে; আয়, ভোগ, ব্যয়, বিনিয়োগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ইহলৌলিকক ও পারলৌকিক সাফল্যের অঙ্গীকার রয়েছে। কিন্তু কোনটাই নিরংকুশ নয়, লাগামহীন নয়। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। মানুষ সম্পদের ব্যবহারকারী। মানুষ আল্লাহর খলীফা হিসেবে সকল সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর তাই মানুষ সম্পত্তি নিজের পরিবারের, দেশের ও সার্বিকভাবে সমগ্র মানব জাতির স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু এর অপব্যবহার করার, শোষণের হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহারের কোন অধিকার তার নেই। এ ক্ষেত্রে মানুষের মালিকানা হচ্ছে আমানতী মালিকানা। প্রত্যেক মানুষকে তার সম্পদ ব্যবহারের জন্য মূল মালিক আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র আল্লাহ নির্দেশিত পথেই সম্পদ উপার্জন ও

www.pathagar.com

ভোগ করবে, সমাজে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হবে; বৈধতার মানদণ্ডেই আয়-উপার্জন করবে এবং সম্পদের মালিকানা ও বণ্টন নির্ধারিত হবে।

বস্তুতঃ অবৈধ, হারাম ও অসৎ উপায়ে উপার্জনের ফলেই সমাজে ধন বণ্টনে বৈষম্য দেখা দেয়। ইসলামে উপার্জন হালাল-হারামের বিধি নিষেধে নিয়ন্ত্রিত। ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগ শরীয়াহ বিধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এবং ইসরাফ (অপচয়), তাবজীর (অপব্যয়) ও বিলাসের সমর্থন অবাঞ্ছিত, সেক্ষেত্রে অর্জিত আয়ের ব্যয় ও বণ্টন হবে উৎপাদনমুখী। প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় এখানে বিধি বহির্ভূত, ইনফাকের উপর রয়েছে বিপুল উৎসাহ। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষেরই কল্যাণের সমন্বিত সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, যার মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের ভুল থাকবে না, সমাজতান্ত্রিক কমাণ্ড-অর্থনীতির মানবতাহীনতার সুযোগ থাকবে না।

ইসলামের সম্পদ অর্জন, ব্যয় ও বণ্টনের বিষয়সমূহ যুক্তিসঙ্গত পন্থায় এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

এ বিষয়ে লেখার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বাংলাদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম নকীব প্রফেসর এ কে এম নাজির আহমদ। সেমিনার প্রবন্ধ হিসেবে প্রথমে এটি লিখিত হয় এবং মাসিক পৃথিবীতে তা ছাপা হয়। পরবর্তীতে অগণিত পাঠকদের দাবীর প্রেক্ষিতে এটিকে গ্রন্থের রূপ দেয়া হয় যা এক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছে।

সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ সাদরে এ গ্রন্থটি গ্রহণ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। একই সাথে তাদের মূল্যবান পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির আরো উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। গ্রন্থখানি রচনায় অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখকের গ্রন্থ ও দেশী বিদেশী অসংখ্য প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং অগণিত বন্ধু শুভাকাঙ্খীদের অকৃত্রিতম কার্যকরী উপদেশ লাভ করেছি।

আহসান পাবলিকেশন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায়– আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এ কামনা করছি তিনি যেন এই বইটিকে কবুল করেন এবং আমাদের জাতির জন্য এটিকে কল্যাণকর করে দেন।

ঢাকা
৫ ডিসেম্বর, ২০০৭

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

www.pathagar.com

সূচি

❖ ইসলামের কল্যাণকামী আদর্শ ১১

ক. ইসলামে সম্পদ অর্জন ১৫

❖ ইসলামের সম্পদ উপার্জনের উপায় ২১

❖ সম্পদ অর্জনের হালাল উপায়সমূহ ২২

১. শ্রমলব্ধ পন্থা ২১

২. ব্যবসা-বাণিজ্য ২৫

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ২৬

৩. চাকুরী ২৬

৪. ধার-কর্জ ২৭

৫. দান-দক্ষিণা ২৭

❖ উপার্জনের হারাম উপায় ২৮

১. সুদ ২৯

২. ঘুষ ৩১

৩. জুয়া ৩৩

৪. বাজী ৩৪

৫. লটারী ৩৪

৬. মজুতদারী ৩৫

৭. কালোবাজারী ৩৫

৮. ফটরাবাজারী ও ডাম্পিং ৩৬

৯. মুনাফাখোরী ৩৬

১০. চোরাচালান ৩৭

১১. ক্ষমতা ও পদের প্রভাব খাটিয়ে অর্থোপার্জন ৩৭

১২. প্রতারণা বা ছলনা ৩৮

১৩. হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ৩৯

১৪. ভেজাল পণ্য বিক্রি করে আয় করা ৪১

১৫. ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ৪২

১৬. ওজন ও পরিমাপে কম দিয়ে অর্থোপার্জন ৪২

১৭. বেশ্যাবৃত্তি/পতিতাবৃত্তি ও ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন ৪৩

১৮. অশ্লীলতা প্রসারকারী উপায় উপকরণের ব্যবসা ৪৪

১৯. মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা ৪৪

২০. মূর্তি বানানো ও বিপণন ৪৭

২১. ভাগ্য গণনার ব্যবসা ৪৮

www.pathagar.com

২২. জবরদখলের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ৪৮
২৩. লুণ্ঠন কার্য ৪৮
২৪. ছিনতাই-রাহাজানি ৪৯
২৫. যাদু মন্ত্রের ব্যবসা ৪৯
২৬. চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ৫০
২৭. আত্মসাৎ ৫২
২৮. চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয় ৫২
২৯. আমানতের খিয়ানত করে সম্পদ উপার্জন ৫২
৩০. ধাপপাবাজি ৫২
৩১. টেণ্ডারবাজি ৫৩
৩২. চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে উপার্জন করা ৫৩
৩৩. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ৫৩
৩৪. ইয়াতীমের সম্পদের বল্গাহীন ভোগ ব্যবহার এবং তা থেকে উপার্জন ৫৪
৩৫. সর্বপ্রকার জুলুমের মাধ্যমে অর্থ আয় ৫৪
৩৬. সন্ত্রাস ৫৪
৩৭. চাঁদাবাজি ৫৪
৩৮. মাস্তানী ৫৫
৩৯. সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ৫৫
৪০. মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থোপার্জন ৫৫
❖ হারাম উপায়ে উপার্জন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ৫৭
খ. ইসলামে ব্যয়ের নীতিমালা ৫৮
❖ অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় ৫৯
❖ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক নীতিমালা ৬০
❖ ব্যয়ের ক্ষেত্রে নেতিবাচক নীতিমালা ৬১
গ. প্রবৃদ্ধি, বণ্টন ও কল্যাণ ৬৩
❖ অসমতা ও বণ্টন ৬৬
❖ ইসলামের বণ্টন নীতি ৬৯
❖ আয় ও সম্পদ বণ্টনের নিম্নমাত্রা ৭০
❖ সমমুখী বণ্টন পদ্ধতি ৭০
❖ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন ৭৪
❖ হস্তান্তরজনিত বণ্টন ৭৮
❖ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য ৮১
❖ সরকারের নিকট হতে জনগণের নিকট হস্তান্তর ৯৪
❖ শেষকথা ৯৫

www.pathagar.com

ইসলামে সম্পদ অর্জন
ব্যয় ও বণ্টন

ইসলামের কল্যাণকামী আদর্শ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো মানব কল্যাণ। ইসলামী শরীয়াতের সকল প্রকার আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধের লক্ষ্যই হলো মানুষের জন্য সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। কল্যাণের ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে ফালাহ। ফালাহ (Falah) বা কল্যাণ শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফালাহ শব্দটি এবং এর থেকে উদগত শব্দ পবিত্র কুরআনে ৪০ বার ব্যবহার করা হয়েছে। আর একটি শব্দ 'ফাউজ' যা ফালাহ শব্দটির সমার্থক এবং এর থেকে উদগত শব্দ পবিত্র কুরআনে ২৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলাম ব্যক্তি মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এক ব্যাপক, ভিন্নধর্মী ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা পেশ করে। ইসলামের উদ্দেশ্যকে ড. এম. ওমর চাপরা বর্ণনা করেছেন 'মাকাসিদ আল শরীয়াহ' হিসেবে। যা শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে 'ফালাহ' বা কল্যাণ আহরণ এবং 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বা পবিত্র জীবন বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি হচ্ছে সেই লক্ষ্য যার দিকে প্রতিদিন মুয়াজ্জিন পাঁচবার বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে থাকেন। এভাবে ইসলামের বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে ফালাহ এর প্রতি গুরুত্ব প্রদর্শন করা হয়।[১]

মানব জাতির জন্য আশীর্বাদ হওয়া ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য যার জন্য মহানবী (সা)-কে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। (২১ ঃ সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৭)

বর্ণ, বংশ, বয়স, লিঙ্গ বা জাতীয়তা নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষের 'ফালাহ' বা সত্যিকার মঙ্গল নিশ্চিত করা এই লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম অপরিহার্য পন্থা। শুধুমাত্র ইসলামী সমাজই নয় বরং সব সমাজের লক্ষ্যই হচ্ছে ফালাহ। কথাটি

---

১. ড. এম. উমর চাপরা, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন (প্রবন্ধ), অর্থনৈতিক গবেষণা, সংখ্যা-৯, অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ৫। ড. এম. উমর চাপরা প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ। তিনি পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি সৌদী মনিটরি এজেন্সীর এডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ইসলামিক রিসার্চ এণ্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (IRTI) এর গবেষণা উপদেষ্টা।

www.pathagar.com

অবশ্যই সত্যি, কেননা দুনিয়ার সব সমাজের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই বললেই চলে যে উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ফালাহ' বা মানুষের মঙ্গল বিধান করা। তবে ফালাহ বা কল্যাণের সংজ্ঞা, উপাদান ও সেটা অর্জনের কৌশল সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্তমান দুনিয়ার অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম স্পষ্ট পথ নির্দেশ দিয়ে থাকে। এ পথনির্দেশ পাওয়া যায় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল পর্যায়ে এবং সমস্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে। এমনকি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও।

আরবী ফালাহ শব্দটি এসেছে আফলাহা, ইউফলিহু থেকে যার অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধি অর্জন করা, উন্নতি করা, সুখী হওয়া, কৃতকার্য হওয়া।

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানীর[২] মতে 'ফালাহ' শব্দ পার্থিব জীবনের জন্য তিন অর্থ তুলে ধরে। যেমন–

১. বাকা [Survival] – বেঁচে থাকা

২. ঘ্যানা [Freedom from Want] অভাব থেকে মুক্তি

৩. ইজ্জ [Power and Honour] – ক্ষমতা ও সম্মান

আর আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য 'ফালাহ'র চারটি অর্থ হচ্ছে–

১. বাকা বিল ফানাহ [Eternal Survival] –অনন্ত জীবন সত্তাকে সার্থক করা

২. ঘ্যানা বিল ফকর [Eternal Prosperity] – অনন্ত সমৃদ্ধি

৩. ইজ্জ বিল দুউল [Everlasting Glory] –চিরস্থায়ী সম্মান

৪. ইলম বিল জাহেল [Knowledge Free from all Ignorance] – অজ্ঞতামুক্ত জ্ঞান

ড. শেখ মকসুদ আলী[৩] 'ফালাহ'র তিনটি অর্থ করেছেন–

ক. অপরের সুখ কামনা করা [Wish happiness]

খ. অন্যের সুখে সুখী হওয়া [Share happiness]

গ. অপরের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেয়া [Share Sufferings]

---

২. আল্লামা রাগিব আল ইস্পাহানী, আল মুফরাদাত ফি গারীব আল কুরকান (করাচী)।

৩. সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। গত ৩১শে জুলাই ২০০৪ ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো আয়োজিত 'Structural Characteristics and Development in an Islamic Perspective' শীর্ষক সেমিনারের প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পরকালের অনন্ত অসীম জীবনে কল্যাণ [Falah] লাভ করা। ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, এ বিশ্বজাহানের সবকিছু একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে মানব কল্যাণের গঠন উপকরণ শুধু বস্তুবাদী লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বস্তুবাদী লক্ষ্যের সাথে আধ্যাত্মিক উপকরণও সমগুরুত্ব সহকারে সংযুক্ত। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, মানুষ কখনো সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ইহকাল ও পরকালের উভয় জগতের প্রয়োজনের একটি সুষম তৃপ্তি লাভ করে। ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতের সর্বাধিক কল্যাণ করাই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। এ কল্যাণ এমন যা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না, অথচ তা তার দৈহিক আরাম, মানসিক শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করে।[৪] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার বলেছেন, মদীনায় যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, কালক্রমে তা একটি সুদমুক্ত যাকাত ভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ সমাজের সৃজন করেছিল, যেখানে ছিল না শোষণ, বৈষম্য, যুলুম, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও অকল্যাণ। ইসলামের কল্যাণকামিতা ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত এবং অবিভাজ্য। এ কারণে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে কল্যাণ অর্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।[৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে এ ফালাহর কথা কুরআন মাজীদে চল্লিশবার আলোচনায় এসেছে। ইসলামে কল্যাণ সর্বাধিক হয় তখন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কল্যাণ বিঘ্নিত না করে নিজের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অবকাঠামোর মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।

ইসলাম মানব জীবনকে একটি একক হিসেবে দেখে (Islam looks at life

---

৪. অধ্যাপক ড. এম. এ. হামিদ, মানব কল্যাণ ও ইসলামী অর্থনীতি, দৈনিক সংগ্রাম, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ. ৫।

৫. লুৎফর রহমান সরকার, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মাসিক আল ফুরকানের যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৪ জানুয়ারী ১৯৯৭ জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে প্রদত্ত লিখিত ভাষণ, পৃ. ১।

www.pathagar.com

as a composite whole)। মানব জীবনের দু'টি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। দুনিয়ার জীবন বা ইহ্জাগতিক জীবন যা ক্ষণস্থায়ী, আর আখিরাতের জীবন, যা চিরস্থায়ী। এ পর্যায়দ্বয়ের কোন একটিকে বাদ দিয়ে মানুষের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করা যায় না। আখিরাতকে বাদ দিয়ে ইহ্জাগতিক শান্তি অন্বেষণ করা মানব সুলভ বুদ্ধিমত্তার পরিপন্থী। আবার দুনিয়াকে বাদ দিয়ে শুধু আখিরাতের মঙ্গল কামনা করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। সুতরাং ইসলাম এ উভয় প্রকার চরমপন্থার বিরোধী। ইসলামের সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থায় বৈরাগ্যের কোন স্থান নেই। অন্যদিকে আখিরাতকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার সুখের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া চরম নিন্দনীয়। মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ তখনি অর্জিত হতে পারে, যখন তা জীবনের উভয় পর্যায় তথা দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে বিস্তৃত হয়। আর ইসলাম তাই চায়। ইসলাম মানুষের ইহ্কাল ও পরকালের জীবনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ্ পাক মানুষকে জীবনের উভয় পর্যায়ের কল্যাণ কামনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর শেখানো দোয়া হচ্ছে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দিন এবং আখিরাতের কল্যাণ দিন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।' (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

এখানে দুনিয়া ও আখিরাতের হাসানার কথা বলা হয়েছে। যা মানুষের জন্য ভাল ও কল্যাণকর, তাই হাসানা। এ হাসানা জীবনের উভয় পর্যায়ের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং দুনিয়ার কল্যাণও শরীয়াতের লক্ষ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার জীবনের বিশেষ একটি দিকের প্রতি দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে সার্বিক মঙ্গল লাভ করা যায় না। সমকালীন দর্শনের কোনটি অর্থনীতি ও ভোগকেন্দ্রিক, কোনটি রাজনীতি সর্বস্ব আবার কোনটি বৈরাগ্যভিত্তিক। ইসলাম এরূপ প্রান্তিক একদেশদর্শী মতবাদে বিশ্বাসী নয়, কারণ তা সার্বিক মঙ্গল বিধান করতে পারে না। একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা হিসেবে তাই ইসলাম অর্থনীতিসহ জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ দিকদর্শন দেয়। দুনিয়ার কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন। আখিরাতের জন্যও এর অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

ক. ইসলামে সম্পদ অর্জন

ইসলামে সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ ছাড়া সকলের মঙ্গল নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না। এজন্যই হালাল রুজির জন্য চেষ্টা চালানোর তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাহিদা পূরণে নিজের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাবে। নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরজে আইন। ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনকে অভাবমুক্ত করার জন্য ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য জীবিকা উপার্জনের নির্দেশ দান করে। ধন ও সম্পদ অর্জনের প্রতি ইসলাম প্রচুর উৎসাহ দিয়েছে। সম্পদ অর্জন বৈধ। বৈধভাবে সম্পদ অর্জনে ইসলামে কোন বাধা নেই। সৃষ্টি জগতের সবকিছুই মানুষের রুজি রোজগারের জন্য। আল্লাহর নেয়ামত হতে বুদ্ধি ও মেহনতের মাধ্যমে রুজি-রোজগার কামাই করে খেতে হবে। মানুষ সাধ্যমত উপযুক্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে জীবিকা আহরণ করবে। এ ক্ষেত্রে সকলের হক সমান। জীবিকার জন্য যা অপরিহার্য তা সকলের জন্যই সমান। জীবিকার প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত থাকা ও কাউকে বঞ্চিত করা হারাম। এ পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণ করা, আয় উপার্জন করা এবং এ লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাকুরী করা স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছারই বাস্তবায়ন। সালাত শেষ হলে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের সন্ধানে-সম্পদ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর ফযল (রিযিক) অনুসন্ধান কর। (৬২ ঃ সূরা আল জুমুয়া ঃ ১০)

وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ.

এবং দিবসের নিদর্শনকে আমি আলোকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করতে পার। (১৭ ঃ সূরা বনী ইসরাইল ঃ ১২)

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.

এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময় করেছি। (৭৮ ঃ সূরা আন নাবা ঃ ১১)

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ.

www.pathagar.com

আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। (৭ ঃ সূরা আল আরাফ ঃ ১০)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

তিনিই তোমাদের জন্য যমীনকে কর্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা তার দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড় এবং তার দেয়া আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট। (৬৭ ঃ সূরা আল মুলক ঃ ১৫)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ.

তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অনুসন্ধানে কোন দোষ নেই। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮)

স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ.

তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে অর্পন করো না। (৪ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ৫)

وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.

তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেও না। (২৮ ঃ সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭)

কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াতে আরো স্পষ্ট ও সহজভাবে বলা হয়েছে যে, ধরা পৃষ্ঠে, সমুদ্র বক্ষে এবং জান্নাতে যা কিছু দেখা যাবে এ সবই মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং এ সমস্তই তিনি মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। মানুষকে এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে, এগুলো থেকে উপকৃত হতে হবে অত্যন্ত ন্যায়ানুগভাবে এবং তাকে বিবেচনায় আনতে হবে আখিরাতের চিন্তাকে সামনে রেখে।

উপার্জন করতে হলে কাজ করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

মহানবী (সা) বলেন ঃ كَسْبُ الْحَلاَلُ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضَ.

হালাল জীবিকার অনুসন্ধান আল্লাহর ফরযসমূহের পর অন্যতম ফরয।' (রাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.)

www.pathagar.com

মহানবী (সা) বলেন, 'প্রতিটি মুসলমানের জন্য বৈধ জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক।[৬]

তিনি এ বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য বলেন, 'কোন ব্যক্তি তার নিজের প্রচেষ্টায় যা উপার্জন করে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।[৭]

হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদিকারিব (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহর উপর বিশ্বাসের অর্থ এটি নয় যে, একজন মুসলিম কোন চেষ্টা চালানো থেকে বিরত থাকবে, প্রকৃতপক্ষে তাকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে, কিন্তু সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ঐ ব্যক্তির প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে যিনি তার উটকে না বেঁধে এমনিই ফেলে রাখলেন আর ভাবলেন উটটি যাবে না, কেননা আল্লাহ উটটির যত্ন নেবেন। মহানবী (সা) প্রথমে তাকে উটটি বেঁধে রাখতে বললেন এবং এর পর আল্লাহর উপর ভরসা করার উপদেশ দিলেন।[৮]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জনের ইসলামী অনুশাসনের প্রতি জোর দিয়েছেন।

মানব মর্যাদার একটি অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই প্রয়োজন পূরণ করতে হবে, সে অনুসারে ফকীহগণ প্রত্যেক মানুষের তার নিজের ও তার পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে উপার্জন করাকে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব (ফরযে আইন) আখ্যা দিয়েছেন। যে হাত উপরে আছে তা নীচে পেতে রাখা হাতের চেয়ে ভাল।[৯]

যারা আসলেই অভাবী নয় এবং যারা স্বাস্থ্যবান ও শারীরিক দিক থেকে সক্ষম তাদের দান করাকে মহানবী (সা) অবৈধ ঘোষণা করেছেন।[১০]

যে নিজের জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করে থাকে তার উচ্চ মর্যাদার কথা মহানবী (সা) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থেকে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে এবং তার প্রতিবেশিদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে

---

৬. সুয়ূতি, আল জামিউল আল সাগির, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, পৃ. ৫৪।

৭. সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২১৩৮, ভলিউম ২ (১৯৫২) পৃ. ৭২৩।

৮. দেখুন মুহাম্মদ ইবনে আশ শায়বানি ও আল সারাখসি, কিতাব আল কাসব ও কিতাব আল মাসবুত, ভলিউম ৩০, পৃ. ২৪৯।

৯. সহীহ আল বুখারী, ভলিউম-২, পৃ. ১৩৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণিত।

১০. আবু দাউদ, ভলিউম-১ (১৯৫২) পৃ. ৩৭৯, নাসাঈ ভলিউম-৫ (১৯৬৪) পৃ. ৭৪ এবং ইবনে মাজাহ, ভলিউম-১ (১৯৫২) পৃ. ৫৮৯ ঃ ১৮৩৯)

www.pathagar.com

বৈধভাবে দুনিয়ার সম্পদ চায়, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যেন তার চেহারা পূর্ণ চন্দ্রের মত আলোকিত থাকবে।[১১] জীবিকার্জনের চিন্তা বা ফিকিরকে গুনাহ্ মাফের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন মহানবী (সা)। তিনি বলেন, এমন কিছু গুনাহ আছে, সালাত, হজ্জ এবং উমরাহ যা মিটাতে পারে না, জীবিকা অর্জনের চিন্তা তা মিটাতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে একটি বর্ণনা হলো, 'জান্নাতে এমন একটি স্তর রয়েছে যা কেবলমাত্র ঐসব লোক লাভ করবেন যারা জীবিকার্জনের চেষ্টায় রত থাকে।' (দাইলামী)

অনেকে রুটি-রুজির জন্য সচেষ্ট হওয়াকে তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করেন। তারা মনে করেন এসব দুনিয়াবী কাজ। জীবিকার্জনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করা, চেষ্টা-সাধনা করা মুমিনের কাজ নয়। মুমিনের কাজ হলো সারাদিন ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে আর আল্লাহ্ পাক তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কখনো আল্লাহ পাকের সুন্নাহতে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না। (৩৩ ঃ সূরা আল আহযাব ঃ ৬২)

চেষ্টা ছাড়া আল্লাহ কিছু দেন না, তাই জীবিকার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে– এটাই আল্লাহর বিধান। এজন্যই মহানবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক চেষ্টার মাধ্যমে তালাশ কর এবং পরনির্ভরশীল হয়ে থেকো না। (জামিউল বয়ান, ইউসুফ বিন আবদুল বার আল কুরতুবী)

এ থেকে বুঝা যায়, ধন-সম্পদ অর্জন করে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভে ইসলাম যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। সুতরাং বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইসলামী আদর্শের অন্যতম কাম্য বিষয়।

ধন-সম্পদ উপার্জন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু ধন-সম্পদ মানুষের উদ্দেশ্য নয়। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে ৫টি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। এ ৫টি বিষয়ের মধ্যে দুইটি বিষয় হচ্ছে 'সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছ এবং কোন পথে ব্যয় করেছ।'

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ একটি নিয়ামত, একটি অনুগ্রহ। ইসলাম এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বলে। আবার ইসলামে সম্পদ একটি আমানত। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী সব সম্পদের মূল মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।

---

১১. মিশকাত, ভলিউম-২, পৃ. ৬৫৮ ঃ ৫২০৭, আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, বায়হাকির শুয়াব আল ঈমান গ্রন্থে সংকলিত।

www.pathagar.com

মানুষ এ সম্পদের আমানতদার মাত্র। এ আমানতদারীর অর্থ হলো মানুষ স্বীয় আওতাধীন সকল উপায়-উপকরণ আল্লাহ্ প্রদেয় নিয়মে ব্যয় ও ভোগের কাজে ব্যবহার করবে। সম্পদ এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যেন তা মুষ্টিময় লোকের নয় বরং সকলের উপকারে আসে। অন্যদিকে যাবতীয় আয়-উপার্জনও হতে হবে বৈধ। বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদও আল্লাহর মর্জির বাইরে বা আমানতের শর্তের বাইরে ভোগ, ব্যয় বা ব্যবহার করা যাবে না। তাই সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণ করতে হবে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সততা ও সচেতনতার সঙ্গে এর ব্যবহার করতে হবে, সবার চাহিদা পূরণ, জীবনকে আরামদায়ক করতে হবে; সম্ভব হলে তা প্রত্যেকের জন্যই করতে হবে, আয় ও সম্পদের সমবণ্টন করতে হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ কঠোর তপস্যা ও আত্মঅস্বীকৃতির অনুমোদন দেয়নি। কুরআন বলছে, আর বৈরাগ্যবাদ (সন্যাসবাদ) যা তারা আবিষ্কার করেছে, আমরা তা তাদের জন্য মনোনীত করে দেইনি।[১২] সম্ভবত এ কারণেই মহানবী (সা) বলেন, সেই ব্যক্তির জন্য সম্পদ কোন ক্ষতির কারণ নয়, যিনি আল্লাহকে ভয় করেন (অর্থাৎ কাজ করা থেকে বিরত থাকেন)।[১৩]

ইসলাম বৈরাগ্যবাদ পরিহার করার নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। মূল্যবোধ ও প্রনোদনা পদ্ধতি প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী মূল্যবোধ ছাড়া সম্পদ স্বয়ং একটি উদ্দেশ্যে হয়ে পড়ে। তখন এটি বিবেক বর্জিত হয় এবং অসমতা, বৈষম্য ও বাড়াবাড়ির সৃষ্টি করে, যা শেষতক বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকাংশ সদস্যের কল্যাণ হ্রাস করে। কাজেই আদর্শে বিশ্বাস ও সম্পদ উভয়টিই মানুষের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এ দু'টির কোন একটিকে পরিত্যাগ করা যায় না। সম্পদই আল্লাহর প্রতি মানুষের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা প্রদান করে, এর পাশাপাশি মানুষ তার নিজের, স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, অন্যান্য মানুষ, জীবজন্তু এবং পরিবেশের প্রয়োজন সম্পদের দ্বারাই পূরণ করতে পারে।

ইসলাম তার অনুসারীদের অবাধে যেন তেন পন্থায় সম্পদ উপার্জনের অধিকার দান করেনি। জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে উপার্জনের পন্থা ও উপায়সমূহের উপর হালাল হারামের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

---

১২. ৫৭ ঃ সূরা আল হাদীদ ঃ ২৭

১৩. আল আদাব আল মুফরাদ, পৃ. ১১৩

www.pathagar.com

ইসলামী বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপার্জন, উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউ স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে থেকে যে কেউ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এ জন্য সে পছন্দসই যে কোন উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যেকোন পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলাম পূর্ব যুগে তো দূরের কথা বর্তমান সভ্য যুগেও অন্যান্য মতাদর্শ ও ইজম ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে এই বৈধতা বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত কর কিংবা শুল্ক দিলেই যে কোন পরিমাণ আয়েই তার বৈধ মালিকানা স্বীকৃত হবে।

পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে উপার্জন, উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে কোন শেষ সীমা বা বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন নেই। এমনকি যেসব পন্থায় উৎপাদন সমাজের জন্যে ক্ষতিকর ও যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ ও অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। শর্ত শুধু লাইসেন্স করে নেয়া বা নির্দিষ্ট হারে কর বা ফি ও শুল্ক নিয়মিত পরিশোধ করা। খুব সহজভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দয়া, ভালবাসা, সহমর্মিতা, পরোপকার ইত্যাদি মানবীয় ও নৈতিক বিষয়গুলো পরিত্যাগ করলেই তার ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি পাওয়া যায়। এ অর্থনীতিরই নামকরণ করা হয়েছে তথাকথিত ইতিবাচক অর্থনীতি (Positive Economics) হিসেবে। সমাজতন্ত্রের অবস্থাও প্রায় একই রকম। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অতিমাত্রায় সীমিত। তবে ভোগের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন কমিউনিষ্ট পার্টির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য এসব নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই শিথিলযোগ্য। ইসলামে এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করা হয়নি। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ সকলের জন্যই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যই সমভাবে নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

ইসলামে সম্পদ উপার্জনের উপায়

দু'উপায়ে সম্পদ আহরণ করা হয়। যেমন–

১, হালাল উপায়

২. হারাম উপায়

সম্পদ অর্জনের হালাল উপায়সমূহ

১. শ্রমলব্ধ

২. ব্যবসা-বাণিজ্য

৩. চাকুরী

৪. ধার-কর্জ

৫. দান-দক্ষিণা

১. শ্রমলব্ধ পন্থা ঃ ইসলামে সম্পদ অর্জনের হালাল উপায়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রমলব্ধ পন্থা। এ উপায়কে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

ক। নিজে উপার্জনের নীতি ঃ কুরআনে প্রত্যেক নামাযীকে আল্লাহর ফযল (অনুগ্রহ) তালাশ করতে আদেশ করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, কোন মানুষের নিজের চেষ্টায় উপার্জিত আয়ের চেয়ে আর কোন উপার্জনই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। (ইবনে মাজাহ)

যে চেষ্টা করবে, রিযিকের সন্ধানে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে সে রিযিক পাবার যোগ্য। আর যে অলস ভঙ্গিতে বসে থাকে সে বঞ্চিত হবারই যোগ্য। বর্ণিত আছে হযরত উমর (রা) দেখলেন, একদল লোক সালাতুল জুমার পর আল্লাহ ভরসা বলে মসজিদে নিশ্চল বসে আছে। তখন তিনি তাঁর বেত্র উচিয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করলেন, 'তোমরা কেউ রিযিকের অনুসন্ধান ত্যাগ করে বসে থেক না। আর বলো না হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দাও।' কারণ, আকাশ স্বর্ণ বা রৌপ্য বর্ষণ করে না।' আল্লাহ বলেই দিয়েছেন, যখন সালাত সমাপ্ত হয় জমিনে ছড়িয়ে পড়। আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।' হযরত উমর (রা)-এর বেত্র আইনী প্রভাবের প্রতীক; আল্লাহর হুকুম ও বিধানের বাস্তবায়নে সরকারী হস্তক্ষেপের নমুনা। যারা কুরআনের লিখিত সুস্পষ্ট নির্দেশ পেয়েও সতর্ক হয় না তাদের জন্য প্রয়োজন সরকারী শাসন। যে নিজের জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করে থাকে তাকে উচ্চ মর্যাদা প্রদানের কথা মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

খ। নিজে কাজ করার নীতি ঃ ইসলামে কাজকে পুণ্য এবং অলসতাকে পাপ গণ্য করা হয়েছে। কুরআনে মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'আর আপনি বলে দিন, তোমরা কাজ করে যাও, তার পরবর্তীতে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুসলমানগণ সকলেই দেখবেন যে তোমাদের কর্মনীতি কেমন হয়।' (৯ ঃ সূরা আত তাওবা ঃ ১০৫)

ইসলামে কাজকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলা হয়েছে। কায়িক শ্রম ইসলামে সম্মানিত স্থান লাভ করেছে। মহানবী (সা) বলেছেন, মানুষের নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে ভাল অন্য কোন উপার্জন নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।[১৪] হযরত হাকেম (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) ছিলেন লৌহবর্ম প্রস্তুতকারক, হযরত আদম (আ) ছিলেন চাষী, হযরত নূহ (আ) ছিলেন কাঠমিস্ত্রী, হযরত ইদ্রিস (আ) ছিলেন দর্জি আর হযরত মূসা (আ) ছিলেন রাখাল।[১৫] মহানবী (সা) জনৈক শ্রমিকের হাতে চুমু খেয়েছেন বলেও উল্লেখ রয়েছে। তিনি নিজে শ্রম দিয়ে জীবনোপকরণ সংগ্রহ করেছেন। শ্রমের কারণে একবার তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। সেই ফোসকা পড়া হাত দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এই হাতকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন ঃ اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ। 'শ্রমজীবীরা আল্লাহর বন্ধু।' ইসলামে বৈরাগ্যবাদ, সন্ন্যাসবাদ ও ব্রাহ্মচর্যকেও নিন্দা করা হয়েছে। যারা জীবিকা অর্জনের জন্য কোন কাজ না করে সব সময়ে শুধু ইবাদতে মশগুল থাকে তাদেরকে যারা খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দেয় তারা প্রথমোক্তদের চেয়ে উত্তম বলে মহানবী (সা) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন।[১৬]

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো জনগণকে কাজের সুযোগ করে দেয়া এবং একই সঙ্গে ব্যক্তির দায়িত্ব হলো কাজের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

---

১৪. সহীহ বুখারী, মুসলিম

১৫. মুস্তাদরাকে হাকেম

১৬. ড. মনযের কাহফ, এ কন্ট্রিবিউশন টু দি থিওরী অফ কনজিউমার বিহেভিয়ার ইন এন ইসলামিক সোসাইটি, ১৯৯২, পৃ. ১৫৪। ড. মনযের কাহফের জন্ম ইরাকে। তিনি বর্তমান বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী অর্থনীতিবিদ। তিনি সৌদী আরবের ইউনিভার্সিতে দীর্ঘদিন অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। এরপর দীর্ঘ পনর বছর জেদ্দা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকে (IDB) কর্মরত থেকে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

www.pathagar.com

গ। কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জনের নীতি ঃ কুরআনে আল্লাহ মানুষকে দেয়া তাঁর অকৃপণ অনুগ্রহ ও উপকরণসমূহ উল্লেখ প্রসঙ্গে কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকার্জনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুরআন বলছে, 'তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি এবং আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন বিভিন্ন গাছের প্রতি লক্ষ্য কর– যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।' (৬ ঃ সূরা আল আনআম ঃ ৯৯)

আল্লাহ বলেন, 'আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও।' (১৫ ঃ সূরা আল হিজর ঃ ১৯- ২০)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষি কাজের জন্য কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও উৎসাহ ব্যঞ্জক বাণী রয়েছে। একে আল্লাহ পাক নিজ অনুগ্রহেই সহজ করে দিয়েছেন। কেউ কৃষি কাজে নিয়োজিত হলে আরও অতিরিক্ত ফায়দা হাসিল করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে, 'কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে বা ফসল চাষ করলে তা থেকে কোন মানুষ বা পশুপাখি খেলে তা ঐ ব্যক্তির জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ঘ। শিল্প ও অন্যান্য পেশার মাধ্যমে উপার্জনের নীতি ঃ ইসলাম শিল্প ও অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবিকার্জনের উপরও গুরুত্বারোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী লিখেছেন, কৃষি কাজ ছাড়াও মুসলমানদের অবশ্যই এমন সব শিল্প, পেশা এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে যা সমাজের জন্য অপরিহার্য, একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য সহায়ক এবং একটা দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য অনুকূল। ইসলামী শরীয়াতে শুধু অপরিহার্য শিল্প ও পেশা গ্রহণের অনুমোদনই দেয়া হয়নি বরং ইসলামের মহান ইমাম ও ফকীহগণ তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য বাধ্যতামূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধরনের বাধ্যবাধকতাকে পর্যাপ্ততার বাধ্যবাধকতা (ফরযে কিফায়া) বলা হয়।[১৭]

---

১৭. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, The Lawful and Prohibited in Islam, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স-১৯৬০, পৃ. ১৩১।

www.pathagar.com

ঙ। স্বনির্ভরশীলতার নীতি ঃ কুরআনে বলা হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (১৩ ঃ সূরা আর রাদ ঃ ১১)

এ নির্দেশনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করার কোন উদ্যোগ নেয়া উচিত হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে কঠোর শ্রম দিতে এগিয়ে না আসবে। অন্যকথায়, ইসলাম এমন সমাজের কল্পনা করে যেখানে কেউ কারো উপর নির্ভরশীল নয়। প্রতিটি মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের মুদারাবার মতো স্বনিয়োজিত কর্মোদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ জন্যই যাকাতের অর্থও দরিদ্রের ক্ষণিকের প্রয়োজন পূরণে ব্যয়ের চাইতে তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তেমনিভাবে ব্যবহারের উপরে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

মোটকথা, সকল সক্ষম সবল মানুষ বৈধ উপায়ে পরিশ্রম করে তাদের জীবিকার্জনের চেষ্টা করবে এটাই ইসলামের দাবী। পৃথিবীতে মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ অর্জন করতে পারে না। আল্লাহর লিখিত নির্দেশ হচ্ছে জীবিকা মানুষকে উপার্জন করতে হবে। এ জন্য মানুষকে শ্রম দিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে।

চ. প্রবাসী হয়ে উপার্জনের নীতি ঃ ইসলাম কর্মসংস্থান ও আয় রোজগারের জন্য বিদেশ গমনকেও উৎসাহিত করেছে। ইসলাম এ কথাই স্পষ্ট করে দেয় যে, আল্লাহর জমি বিস্তৃত। আর রিযিক বিশেষ অঞ্চল ও জনপদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। মহানবী (সা) বলেছেন, سَافِرُوْا تَسْتَغْنُوْا 'প্রবাসে যাও ধনী হতে পারবে'।[১৮] আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً -'যে আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা পাবে।'[১৯] একটি হাদীসের ভাষা এরূপ, মহানবী (সা) মদীনায় এক লোকের সমাধিতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ يَا لَهٗ لَوْ مَاتَ غَرِيْبًا 'আহ এ লোক যদি প্রবাসে মৃত্যুবরণ করত।'

---

১৮. তাবারানী-আওসাত।

১৯. ৪ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ১০০।

www.pathagar.com

যেকোন বৈধ উদ্দেশ্যে পর্যটন, ভ্রমণ, চাকুরীর জন্য, রোজগারের জন্য প্রবাসীদের এর চেয়ে বেশী উৎসাহ দানের দৃষ্টান্ত আর কি আছে।

এসব হাদীসের অনুপ্রেরণায় প্রথম যুগের মুসলমানগণ পৃথিবীর অলিতে-গলিতে গিয়েছিলেন; দীন প্রচার করেছেন, জীবিকার সন্ধান করেছেন, জ্ঞান অন্বেষণ করেছেন; চাকুরী ও কর্মসংস্থানের যোগাড় করে নিয়েছেন। বর্তমান যুগেও মুসলিমগণ একই অনুপ্রেরণায় দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন ও পড়ছেন।

তাই যে নিজের দেশে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র খুঁজে পায় না, জাতীয় সম্পদের স্বল্পতার কারণে বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বা বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়ার কারণে, সে পৃথিবীর অন্যত্র জীবিকা অন্বেষণে সফর করবে। আল্লাহর এ পৃথিবী খুবই বিশাল ও বিস্তৃত। প্রবাসে কর্মসন্ধানী ব্যক্তিদের বিশেষ প্রস্তুতি, ভাষা শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র ও সরকার এ ব্যাপারে তাদের সহায়তা দান করবে।

২. ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ কুরআন ও হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝাতে 'বাই' ও 'তিজারাত' পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।[২০] ইসলামে ব্যবসা ও ব্যবসায়ীর মর্যাদা অত্যন্ত উপরে। মহানবী (সা) বলেন, 'হে উম্মতগণ! তোমরা ব্যবসা কর। কেননা রিযিকের দশ ভাগের নয় ভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে।' 'সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামাতের দিন শহীদগণের, সিদ্দিকগণের ও নবীগণের সঙ্গে থাকবে।' 'সত্যবাদী খাঁটি ব্যবসায়ী (তাজের) কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।' মহানবী (সা) নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন বংশ পরম্পরায়। ব্যবসা-বাণিজ্য মানবজাতির জন্য অত্যাবশ্যক ও কল্যাণকর, তাই হালাল। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। আল্লাহর নেয়ামত, অনুগ্রহ, রিযিকের একমাত্র সম্মানজনক উপায়। কুরআন ও হাদীসে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

---

২০. সূরা আল জুমুয়ার ৯নং আয়াতে 'বাই', সূরা আন নূরের ৩৭ নং আয়াতে 'তিজারাত' ও 'বাই', সূরা আল বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে 'বাই', সূরা রূমের ৪নং আয়াতে নৌপথে ব্যবসা বুঝাতে 'তিজারাত' পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী 'বাই' শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে মালিকানা ও দখলসহ দুই ধরনের পণ্য ও সেবার বিনিময়। পরস্পর ক্ষতিপূরণ করে পণ্য বিনিময় করাকে বলে বাই বা ক্রয়-বিক্রয়। এতে কেউ ঠকে না বা কেউ জিতে না। সকল ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে সমমূল্যের [Utility] বিনিময় হয় এবং তাদের পরস্পর ক্ষতিপূরণ হয়; কারও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না।

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা

১. হারাম পণ্যের ব্যবসা করাও হারাম।

২. সুদ ও সুদভিত্তিক ব্যবসা নিষিদ্ধ। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

৩. ওযন ও পরিমাপে কমবেশী করা নিষিদ্ধ। বিক্রয় প্রক্রিয়ায় ওজন ও পরিমাপে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। (৮৩ ঃ সূরা আল মুতাফফিফীন ঃ ১-৩, ৫৫ ঃ সূরা আর রহমান ঃ ৯)

৪. বিনিময় ও সন্তুষ্টি ছাড়া কারো পণ্য/মাল গ্রহণ করা যাবে না। (১৭ ঃ সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩২)

৫. যিনা ব্যভিচারের ব্যবসা প্রসারকারী পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ। (১৭ ঃ সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩২)

৬. যে কোন অশ্লীলতা প্রসারকারী পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ। (২৪ ঃ সূরা আন নূর ঃ ১৯)

৭. অনিশ্চিত দ্রব্যের/পণ্যের ক্রয় বিক্রয় নিষেধ।

৮. শর্ত ভঙ্গ করা নিষেধ।

৯. আত্মসাৎ নিষিদ্ধ।

১০. মওজুদদারী নিষিদ্ধ (খাদ্যদ্রব্য)।

১১. ভেজাল মিশিয়ে ব্যবসা নিষেধ। (২৬ ঃ সূরা আশ শূআরা ঃ ১৮৩)

৩. চাকুরী ঃ সম্পদ অর্জনের আর একটি উপায় হচ্ছে চাকুরী। যারা চাকুরী করে অর্থ উপার্জন করেন ইসলামে তাদেরকে 'আজীর আল হাস' বলা হয়। 'আজীর আল হাস' হল চাকুরীজীবী যারা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে। এদের বেতন শ্রম ঘণ্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হয়। ইসলামী বেতন নীতির মৌল বিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কর্মরত চাকুরীজীবীদের ন্যায্য বেতনের নিশ্চয়তা বিধান করা। সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ বেতন প্রদান পদ্ধতির আওতায়– ১. মৌলিক প্রয়োজন পূরণোপযোগী বেতন [Salary for meeting basic needs], ২. অতিরিক্ত সুযোগ [Additional benefit], ৩. পারস্পরিক সমঝোতা [Mutual Agreement] ইত্যাদি বিবেচনার দাবী রাখে।

ইসলামী অর্থনীতিতে যথারীতি বেতন দানের উপর যে কতটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা একটি হাদীস থেকে জানা যায়। মহানবী (সা) বলেন, 'শেষ বিচারের দিন আমি তিন প্রকার ব্যক্তির বিপক্ষে অবস্থান নেব ঃ ১. যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

আমার নামে প্রতিজ্ঞা করে অথচ অবিশ্বাসীর মত কর্ম করে। ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে সে অর্থ নিজে গ্রহণ করে। ৩. সে ব্যক্তি যে কোন লোককে কার্যে নিয়োগ করে তার নিকট হতে পূর্ণ কার্য আদায় করে বটে কিন্তু বেতন ঠিকমত দেয় না।[২১]

৪. ধার-কর্জ ঃ ধার-কর্জ করেও অর্থের মালিক হওয়া যায় এবং এটি মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য ব্যাপার। মহানবী (সা)ই প্রথম বিনাসুদে ঋণ বা কর্জ দেয়ার রীতি চালু করেন। এ ধার-কর্জকে কুরআনের পরিভাষায় কর্জে[২২] হাসানা বলা হয়েছে। সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের এটি হচ্ছে একটি বলিষ্ঠ ও প্রত্যয় দৃঢ় পদক্ষেপ। কর্জ হয় কেবল মালে ফানি বা ফানজিবল পণ্য[২৩] [Fungible Goods] এর বেলায়। কোন ফানজিবল পণ্য কাউকে ব্যবহার করতে দিয়ে অর্থাৎ কর্জ দিয়ে তার জন্য আসলের অতিরিক্তি কিছু নেয়া হলে সেই অতিরিক্তকে বলা হয় সুদ। অনুরূপ পণ্য সমপরিমাণ ফেরত দিতে হয়।

৫. দান-দক্ষিণা ঃ দান-দক্ষিণা পেয়েও সম্পদের মালিক হওয়া যায়। নিজস্ব ও পারিবারিক খরচ মিটিয়ে এবং ব্যবসায় বিনিয়োগের পরেও যদি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবে তা থেকে দান করা উত্তম। সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্য দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করা। উপার্জনকারী নিজের প্রয়োজন পূরণের পর তার নিকট যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, তা সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার বিধান রয়েছে। তাই ফরজ-ওয়াজিব অবলিগেশন ছাড়াও সম্পদ স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, ইয়াতিম, মিসকিন ও সাহায্যপ্রার্থীদের এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হয়। মুসলিমদের দান তার জীবদ্দশায় বৃদ্ধি পায়। দান মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করে এবং দানের মাধ্যম আল্লাহ্ দানকারীর মন থেকে হিংসা-অহংকার দূরীভূত করে দেন।

---

২১. সহীহুল বুখারী।

২২. কর্জ কুরআনের একটি পরিভাষা, কুরআনে এ পরিভাষাটি ৬বার এসেছে। কুরআনের সূরা আল বাকারার ২৪৫, সূরা আল মায়িদার ১২, সূরা আল-হাদীদের ১১, ১৭, ১৮ এবং সূরা আল মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতে কর্জ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

২৩. মালে ফানি বা ফানজিবল গুডস [Fungible goods] বলতে এমন পণ্যকে বলা হয় যা নিঃশেষ না করে তা থেকে উপকারিতা [Benefit] লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন- টাকা, খাদ্য-সামগ্রী ইত্যাদি। এসব পণ্য ব্যবহার করে তা থেকে কোন উপকার নেয়া হলে সংশ্লিষ্ট পণ্যটি নিঃশেষ বা রূপান্তর হয়ে যায়। এর অস্তিত্ব বহাল থাকে না। ফানজাবিল গুডসের বৈশিষ্ট্য ৩টি যেমন- ১. একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ বা রূপান্তর হয়ে যাওয়া, ২. এসব পণ্যের সেবা প্রবাহ [Flow of Service] নেই, ৩. পণ্যের সেবা ও সার্ভিসকে পণ্য থেকে পৃথক করতে না পারা।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা দানকে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ করেন। আল্লাহ বলেন, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি বীজের মতো, যে বীজটি বপন করার পর তা থেকে (একে একে) সাতটি শীষ বেরুলো, আবার এর প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ শস্য দানা; (আসলে আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে বহুগুন বৃদ্ধি করে দেন; আল্লাহ তা'আলা দানে অনেক প্রশস্ত, অনেক বিজ্ঞ।[২৪]

মহানবী(সা) বলেন, যে ব্যক্তি অপরকে দয়া করে না আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।[২৫] কোন ব্যক্তিকে দয়া করা হলে সে খারাপ কাজের দ্বারা ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। গোপনে দান সাদাকাহ প্রদান আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং এরূপ দান তার আত্মীয়তার বন্ধন বৃদ্ধি করে ও তাকে দীর্ঘায়ু দান করে।[২৬]

আল্লাহ যার উপর রহমত বর্ষণ করেছেন, সে যদি তার মুসলমান ভাইদের ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন এবং দুর্দশাগ্রস্ত দেখেও সাহায্য না করে, সে অবশ্যই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। ইসলাম সকলকে মুক্ত হস্তে দান করার তাগিদ দিয়েছে যাতে দাতার অন্তরে আনন্দ, উদারতা, কল্যাণ ও ভক্তি এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়।

উপার্জনের হারাম উপায়

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ-সম্পদ উপার্জনে হালাল-হারাম বিবেচনা করতে হয়। এ অর্থনীতিতে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ বা হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী শরীয়ায় নিষিদ্ধ কোন কিছুর স্বত্বার্জনই অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বলে গণ্য হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হারাম অথচ লাভজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা অবৈধ ও বেআইনী। অবৈধ বা হারাম উপার্জন মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। অন্যায়ভাবে সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা বাহ্যিক প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা হলেও এর দ্বারা প্রকৃত সুখ ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করা যায় না। যারা হারাম বা অবৈধ অর্থ-সম্পদের মোহে জীবন ব্যয় করবে তাদের পরকালীন জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে মহানবী (সা) এরশাদ করেছেন, যে দেহ হারাম উপার্জনে কেনা খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে তা জান্নাতে

২৪. ২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১

২৫. সহীহ বুখারী, মুসলিম

২৬. আত-তাবারানী

www.pathagar.com

প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিণ্ড জাহান্নামেরই যোগ্য। (আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী)

এছাড়াও সমাজে অর্থ ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করতে পারে এমন কতকগুলো আয় ও আয়ের পন্থাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। সুদ, ঘুষ বা উপরি আয় বা বখশিষ বা Invisible cost বা Speed money, জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুণ্ঠন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত, ধাপপাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ। এছাড়াও অন্য কোন অসাধু উপায়ে অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ে তোলা যেহেতু অন্যদের ভাগ্যের বিনিময়ে ধনী হওয়ার নামান্তর, সে জন্য ইসলাম সাধারণভাবে তা নিষিদ্ধ করেছে।

উপার্জনে হারাম উপায়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ ঃ

১. সুদ ঃ আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। সুদ মানুষের জন্য অকল্যাণকর তাই হারাম। ক্রয়-বিক্রয়ে দাম নির্ধারণের বিধান লঙ্ঘন করে কোন এক পক্ষের দেয় প্রতিমূল্যের উপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে এবং সে অংশের বিনিময় দেয়া না হলে তাই হয় রিবা বা সুদ। বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে এই অতিরিক্তকে বলা হয় রিবা নাসিয়া; নগদ ক্রয়-বিক্রয়কালে এই অতিরিক্তকে বলা হয় রিবা ফদল। সুদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারীরা যে সুদ দেয় তা নিজে থেকে দেয় না, বরং তারা সুদকে খরচ হিসেবে পণ্য সামগ্রীর দামের সাথে যোগ করে দেয় এবং ক্রেতাদের কাছ থেকে সুদ আদায় করে ঋণদাতাকে দেয়। এভাবে সুদ অসংখ্য ক্রেতার সম্পদ বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে হস্তান্তর করে ঋণদাতার হাতে কুক্ষিগত করে দেয়। দ্রব্য মূল্য আকারে ক্রেতাদের কাছ থেকে সুদ আদায় করার ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে চাহিদা কমে যায়। যার পরিণতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বেড়ে যায়। এজন্যই সুদী অর্থনীতিতে সুদের হার সম্পদ বৃদ্ধি নয় হ্রাস করে। মহানবী (সা) বলেন, আল্লাহ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক, সুদের দলিলের সাক্ষীর ওপর লানত বর্ষণ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

তাই সকল ধরনের সুদ হারাম। সুদ মারাত্মক গুনাহ্। সুদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল বলে শেষ করা যায় না।

ক. সুদ মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা ও কার্পণ্য সৃষ্টি করে, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সঞ্চয়কারীদের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে, নৈতিক অবক্ষয় সাধন করে।

খ. সুদ তারল্য ফাঁদ সৃষ্টি করে, পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়তা করে, সঞ্চয় বাড়ায় না, বেকারত্ব বাড়ায়, বিনিয়োগে বাধার সৃষ্টি করে, উৎপাদন কম হয়।

গ. সুদ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়, ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়, পুঁজির বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয় না, পুঁজিকে অকল্যাণকর খাতে ঠেলে দেয়।

ঘ. সুদ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়, চাহিদা কমিয়ে দেয়, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়, প্রবৃদ্ধির গতিকে মন্থর করে দেয়, বাণিজ্য চক্র সৃষ্টি করে, বিনিময় হারকে অস্থির করে তোলে।

ঙ. অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, মজুরী কমিয়ে দেয়, জুলুম ও বেইনসাফীর জন্ম দেয়।

চ. সুদ রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে, সরকারের সমাজ কল্যাণধর্মী কাজে বাধা সৃষ্টি করে, জাতীয় জরুরী প্রয়োজনে সুদমুক্ত ঋণ পাওয়া যায় না।

ছ. সুদ ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে।

জ. সুদ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে সমস্যা সৃষ্টি করে, বিদেশ নির্ভরতা বাড়িয়ে দেয়, দাতা দেশের স্বার্থ হাসিল করে, বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করে, আন্তর্জাতিক ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঝ. সুদ দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

সুদ দ্বারা ঋণ গ্রহীতার সম্পদ কমে যায়, ঋণদাতার সম্পদ সমপরিমাণে বেড়ে যায়। সুদে এক পক্ষ যে পরিমাণ ঠকে, অন্যপক্ষ সেই পরিমাণ জিতে, ঋণ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে নীচে নেমে যায়, আর ঋণদাতার আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভাল হয়। এটি ইসলামের খেলাপ এবং অর্থনীতির জন্য মারাত্মক।

উপরোক্ত কুফলগুলোর জন্যই সুদ হারাম। সুদভিত্তিক অর্থনীতি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়ে সমাজকে অশান্ত সাগরের বুকে হালবিহীন জাহাজের মত বিপণ্ন করে তোলে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে সুদ বর্জন করা।

www.pathagar.com

২. ঘুষ ঃ কোন সরকারী কর্মকর্তা, বিচারক কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিজের পক্ষে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য বা নিজের পক্ষে বিচারের রায় পাবার জন্য কিংবা উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারে নিজেকে অন্যায়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য যে মাল-সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, শরীয়াতের পরিভাষায় তাকেই রিশওয়াত (رِشْوَةٌ) বা ঘুষ বা উৎকোচ বলা হয়। ঘুষখোররা যে ঘুষ নেয় তার কোন বিনিময় দেয় না, তবে ফাইল আটকিয়ে নেয় বলে এর নাম হয়েছে ঘুষ।

ঘুষের আয় হারাম। ঘুষ বা উৎকোচের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ অবৈধ উপার্জন বলে চিহ্নিত। ঘুষকে বর্তমানে বখশিশ, উপরি আয়, Invisible cost, স্পিড মানি (Speed money) ইত্যাদি যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন এ আয় দিয়ে খাবার কিনে খাওয়া, জীবিকা নির্বাহ করা ও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করা হারাম। কাজেই ঘুষের অর্থ ব্যয় করে খাবার খেয়ে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। মহানবী (সা) বলেন, اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلاَهُمَا فِى النَّارِ অর্থাৎ, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহণকারী দুজনই জাহান্নামে যাবে।

কেউ ঘুষ গ্রহণ করেছে জানা গেলে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হওয়া গেলে, তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। ঘুষ যে নেয় তাকে ঘুষখোর বলা হয়।

ঘুষ এমন এক জঘন্য প্রবণতা; যে সমাজে তা ব্যাপকতা লাভ করে, সে সমাজে প্রশাসনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে; ন্যায় অন্যায়ের কোন পার্থক্য থাকে না, নিয়ম-নীতির কোন বালাই থাকে না, দুর্নীতি হুঁ হুঁ করে বাড়তে থাকে, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। অন্যায় ও জুলুমের প্রতিকার করার প্রবণতা সে সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে লোপ পায়। অপরাধী বুক ফুলিয়ে চলে, আর নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ চরম অসহায়ত্বের মধ্যে পড়ে যায়। নির্যাতিত নাগরিকগণ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ইনসাফ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা বোধ করে না। বিচারের বানী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। এ কারণেই ইসলাম ঘুষের মাধ্যমে জঘন্য পন্থায় ধন উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلاَ تُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًامِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়-অবৈধভাবে আত্মসাৎ করো না, (আবার) জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য এর একাংশ শাসকদের

www.pathagar.com

সামনে ঘুষ (কিংবা উপঢৌকন) হিসেবেও পেশ করো না। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮)

মহানবী (সা)ও এহেন প্রক্রিয়ায় সম্পদ আহরণকারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই লানত করেছেন। (বাযযার, আবু ইয়ালা)

এ ছাড়াও ঘুষ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে উম্মাতের ইজমা রয়েছে। ঘুষের যাবতীয় পন্থাই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

ঘুষের কুফল অনেক। কুফলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. ঘুষ মানুষের মধ্যে উদারতা, সহনশীলতা, দানশীলতা, সহযোগিতা ও উপকারের মনোভাবের পরিবর্তে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, নির্মমতা ও প্রতিশোধমূলক মনোভাবের জন্ম দেয়।

২. ঘুষ মানুষের মধ্যে সীমাহীন লোভ সৃষ্টি করে।

৩. ঘুষ হচ্ছে মানুষের উন্নত ও আদর্শ চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।

৪. ঘুষখোররা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদ ও জরুরী প্রয়োজনের সুযোগে তার নিকট হতে মোটা অংকের ঘুষ আদায়ের চেষ্টায় তৎপর থাকে।

৫. ঘুষ সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক।

৬. ঘুষ সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে।

৭. ঘুষ উৎপাদন ও সঠিক খাতে বিনিয়োগকে বিনষ্ট করে।

৮. ঘুষ পণ্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়ে দেয়। কারণ দ্রুত কাজ সম্পাদনের জন্য যত টাকা ঘুষ দেয়া হয় তা স্বাভাবিকভাবেই পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করে সে হারে তার বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৯. ঘুষ জাতীয় উন্নয়নকে বিঘ্নিত করে। কারণ কোন উন্নয়নমূলক কাজের কার্যাদেশ পাবার জন্য যতটাকা ঘুষ দেয়া হয় ততটাকা বা এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশী নিজ পকেটে রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ সম্পাদন করা হয়।

১০. ঘুষ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা অসৎ লোকদের হাতে তুলে দেয় এবং ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে।

১১. ঘুষের মাধ্যমে এক শ্রেণীর প্রভাবশালী লোক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের অধিক সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

৩. জুয়া ঃ বিনিময় না দিয়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার অন্যতম পন্থা হচ্ছে জুয়া। জুয়ার কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে মাইসির। জুয়া হল অর্থ-সম্পদ লেনদেনের এমন এক প্রক্রিয়া যা হারজিতের উপর নির্ভরশীল, যা দ্বারা দু'পক্ষের এক পক্ষ সমূলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর অপরপক্ষ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই প্রথম পক্ষের অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। আর এক পক্ষের লাভ অন্য পক্ষের ক্ষতির উপর নির্ভরশীল। ফলে এক পক্ষ জিতলে লাভবান হয় আর অপর পক্ষ পরাজিত হয়ে বা হেরে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হয়। তাই জুয়া ধাপ্পাবাজীর উপর নির্ভরশীল। জুয়া ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জুয়া হারাম। জুয়ার বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে। সকল প্রকার জুয়াই সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের জন্য মারাত্মক ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনে। জুয়া দ্বারা যে সব সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি দেখা দেয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. জুয়ার দানে হারতে হারতে অনেক বিত্তবান ব্যক্তি সর্বস্ব হারিয়ে পথের ফকীর হয়ে যায়। সচ্ছল পরিবার সর্বহারায় পরিণত হয়।

২. জুয়াড়ী সর্বস্ব হারানোর পর কুল-কিনারা না পেয়ে চুরি-ডাকাতি-মাস্তানীর ন্যায় জঘন্য কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে।

৩. জুয়ায় পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ, আত্মকলহ, সন্ত্রাস ও হত্যার ন্যায় জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়।

৪. জুয়া পারস্পরিক সম্প্রীতি, সংবেদনশীলতা, ভদ্রতা ও ন্যায় পরায়ণতাকে ধ্বংস করে। জুয়াড়ীর অন্তরে মনুষ্যত্ববোধ, অন্যের কল্যাণকামিতার মনোভঙ্গী আর থাকে না।

৫. জুয়াড়ীর অন্তরে অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হবার মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়।

৬. জুয়ায় হেরে যাওয়া ব্যক্তি মানসিক টেনশনের কারণে বিভিন্ন ধরনের দূরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়।

৭. জুয়ায় অংশ নিয়ে সম্পদ পেয়ে যাবার আশায় আশায় জুয়াড়ী শ্রম ও মেহনত বিমুখ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যে কারণে শ্রম দিয়ে কষ্ট করে উপার্জনের মানসিকতা লোপ পায় এবং সে তার মেধাকেও উপার্জনের কাজে ব্যয় করে না। ফলে এদের শ্রম ও মেধা থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হয়।

৮. জুয়া খেলতে খেলতে প্রচুর সময়ের অপচয় হয়, যা কাজে লাগালে একজন অনায়াসেই স্বাভাবিক জীবন নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে সক্ষম হত।

৯. জুয়া মানুষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়।

১০. জুয়াড়ীগণ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। জুয়া তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

www.pathagar.com

কার্যতঃ জুয়া মানুষের ক্ষতি ছাড়া উপকারে আসে না।

জুয়ার উপরোল্লিত ক্ষতির দিকগুলো চিন্তা করেই ইসলাম জুয়ার যাবতীয় প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন বলছে ঃ হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো) মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করো। আশা করা যায়, তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। (৫ ঃ সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০)

এ আয়াতের আলোকে জুয়া এবং এমন সব পন্থা, যেসবের মাধ্যমে কিছু লোকের অর্থ অন্যদের হাতে কেবল ভাগ্য বা ঘটনা চক্রের মাধ্যমে চলে যায়, তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

৪. বাজী ঃ বাজী রাখার দ্বারা অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়াও মূলতঃ এক ধরনের জুয়া। কেননা বাজীতেও দু'পক্ষ এ মর্মে শর্ত করে থাকে যে, যদি তুমি জয়ী হও তাহলে আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব আর যদি পরাজিত হও তাহলে তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দেবে। এ ধরনের বাজীতে এক পক্ষের নিশ্চিত লাভ ও অপর পক্ষের নিশ্চিত ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। সুতরাং বাজী ইসলামে নিষিদ্ধ। বাজীকররা ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুঁকিতে জড়িয়ে পড়ে। এতে কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কে লাভবান হবে তা অনিশ্চিত। বাজীর কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই।

৫. লটারী ঃ বিনিময় বা দাম না দিয়ে অপরের সম্পদ গ্রাস করার অন্যতম পন্থা হচ্ছে লটারী। লটারী মূলতঃ লাভবান হওয়ার লোভ দেখিয়ে স্বল্পমাত্রায় ব্যাপকভিত্তিক সম্পদ শোষণের এক অভিনব প্রক্রিয়া মাত্র। কেননা উদ্যোক্তারা রাতারাতি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে ১০, ২০, ১০০ টাকা করে টিকেট বিক্রি করে যে অর্থ অর্জন করেন তা থেকে পুরস্কারের টাকা শোধ করেও লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে থাকেন। বিনা মূলধনে বিপুল পরিমাণ টাকা কামানোর এ এক অভিনব কৌশল। কেননা যারা দশ টাকা দিয়ে চল্লিশ লক্ষ টাকা পাবার আশায় টিকেট কিনে থাকেন তারা কিন্তু শোষণের পরিমাণটা কোনদিনই অংক কষে দেখেন না। তাদের সামনে থাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির রঙিন স্বপ্ন। অথচ এ প্রক্রিয়ায় লটারীর আয়োজকরা রাতারাতি পুঁজিপতি বনে যান। আর লোভের বশবর্তী হয়ে শোষিত হন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু পরিমাণে অল্প বলে কেউ গায়ে লাগায় না। অথচ কার্যত এতে দেশের বিপুল জনগণ বিরাট অংকের টাকা গচ্ছা দিয়ে থাকে। এজন্যই ইসলামী শরীয়াত লটারীর মাধ্যমে উপার্জন হারাম ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

৬. মজুতদারী ঃ মজুতদারী ও সম্পদ জমা করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। মজুতদারীর আরবী প্রতিশব্দ 'ইহতিকার' এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Hoarding'। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, পশু-পাখির খাদ্য হোক বা মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যই হোক, ক্রয় করে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাজারজাত না করে আটকিয়ে রাখাকে 'ইহতিকার' বলে।[২৭] Hoarding is to accumulate stores of precious metals, bank notes, coins or goods; can dangerously disrupt the economy when shortages appear.[২৮]

সাধারণভাবে মজুতদারী ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ। অবৈধ মজুতদাররা ইসলামে ঘৃণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দাম বৃদ্ধির জন্য গুদামজাত করে রাখে সে অপরাধী। (সহীহ মুসলিম)

'গুদামজাতকারী অভিশপ্ত' (ইবনে মাজাহ, দারেমী)[২৯] যে ব্যক্তি মূল্যবৃদ্ধির আশায় ৪০ দিন যাবৎ খাদ্যশষ্য আটকে রাখে সে জঘন্য অপরাধী।[৩০] তবে মাল মজুত করলেই কেউ অপরাধী হবে না। হযরত উমার (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন, 'কেউ যদি বাহির থেকে শষ্য সংগ্রহ করে বাজার দামে বিক্রি করে তবে তার এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রশংসিত। অপরদিকে ভবিষ্যতে দাম বাড়ার উদ্দেশ্যে কেউ যদি পরিকল্পনা করে খাদ্যশষ্য আটকে রাখে, তাহলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে দূরে সরে পড়লো।'[৩১] কোন ঘোরপ্যাচে না গিয়ে সোজাসুজি ব্যবসা করতে হবে। ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়যোগ্য পণ্য থাকলে এবং বাজারে তার চাহিদা থাকলে, তা বিক্রি করতে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। জেনে বুঝে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির অভাব সৃষ্টি করার জন্য তা বিক্রি করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা অন্যায়। এটা মানুষকে ব্যবসায়ী নয় ডাকাতে পরিণত করে।

৭. কালোবাজারী ঃ অধিক লাভের প্রত্যাশায় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে মজুত করে রাখা এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হলে সে মজুতকৃত পণ্য সংকটকালে অধিক

---

২৭. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৪৫৩।

২৮. নাসির উদ্দীন আহমদ (১৯৮৯) ব্যাংকিং এণ্ড ফাইন্যান্স ক্যামপেনডিয়াল, ঢাকা; প্র. অ. পৃ. ৫৯।

২৯. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪।

৩০. মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।

৩১. এ বি এম হুসাইন, ইসলামে বাণিজ্যিক আইন, ঢাকা, ১৯৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ২১-২২।

www.pathagar.com

লাভে পশ্চাতদ্বারে বিক্রি করাকে বলে কালোবাজারী (Black marketing)। অসৎ ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে এ পন্থা অবলম্বন করে থাকে। এতে সর্বসাধারণ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। কালোবাজারীর কারণে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং তা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কালোবাজারীরা সর্বসাধারণকে ক্ষুধা কিংবা ভয়াবহ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এ জন্যই কালোবাজারী ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কালোবাজারীদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি থাকবে না। পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করা সুনিশ্চিত। তারা শেষ বয়সে চরম অভাব, দুর্দশা ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং মৃত্যুর সময় কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে। তাদের সন্তান-সন্ততিরা দুর্ভাগা। তারাও নিদারুণ অভাব ও চরম দুর্গতি ভোগ করবে, এটিই তাদের ভাগ্যলিপি।

৮. ফটকাবাজারী ও ডাম্পিং ঃ ফটকাবাজারী ও ডাম্পিং এর মাধ্যমে উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দুর্গতি লাঘবের জন্য অধিক মুল্য নির্ধারণ বা প্রথমে কম মূল্য নির্ধারণ করে প্রতিযোগীদের বাজার থেকে উচ্ছেদ করে পণ্য সরবরাহ ও অধিক মূল্য আরোপ করা (ডাম্পিং) ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ডাম্পিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, হযরত উমার (রা) একজন লোককে বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে 'মুনাক্কা' বিক্রি করতে দেখে বলেছিলেন, হয় তুমি এটা উচিত মূল্যে বিক্রি কর, অন্যথায় আমাদের বাজার থেকে চলে যাও। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

৯. মুনাফাখোরী ঃ ইসলামে মুনাফা বৈধ কিন্তু মুনাফাখোরী (Profiteering) বা মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নীতি নিষিদ্ধ। যে দামে পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হয়, তার চেয়ে বেশী দামে তা বিক্রি করতে পারলেই লাভ হয়। প্রথমে পণ্য বা সেবায় রূপান্তরিত অর্থ এবং পরে পণ্য বা সেবা বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ এ উভয় অর্থের পরিমাণের পার্থক্যই হচ্ছে মুনাফা বা লোকসান। এ পার্থক্য ইতিবাচক হলে বলা হয় মুনাফা আর তা নেতিবাচক হলে হয় লোকসান। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই লাভ-লোকসান হয়ে থাকে। লাভ-লোকসান হচ্ছে চূড়ান্তভাবে বাজারের দান Gift of market বা Result of market. এতে কোন পক্ষেরই হারা-জেতা নেই। এ জন্যই মুনাফা হালাল। কিন্তু মানুষের সরলতা বা অভাব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে অত্যধিক মুনাফা হাতিয়ে নেয়া মুনাফাখোরী হিসেবে চিহ্নিত। অসাধু ব্যবসায়ীদের অতিলাভ ও মুনাফাখোরীর দৌরাত্ম্যে ক্রেতারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে মুনাফাখোরীর মাধ্যমে সম্পদ

www.pathagar.com

আহরিত হয় বলে ইসলাম তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অস্বাভাবিক মুনাফার লোভ করা এবং বাজারে প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতিতে অতিমাত্রায় বেশী মূল্য নির্ধারণ ইসলামে অবৈধ।

১০. চোরাচালান ঃ চোরাচালানের মাধ্যমে অর্থোপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। চোরাচালান বর্তমানে একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সাধারণভাবে যে কোন অবৈধ আমদানি ও রফতানিকেই চোরাচালান বলা হয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালের শুল্ক আইনের ২(ঠ) ধারা মোতাবেক কেবল অবৈধ পথে আমদানি ও রফতানিকে (অর্থাৎ ঘোষিত শুল্ক বন্দর, বিমান বন্দর ও শুল্ক স্টেশন দ্বারা আমদানি ও রফতানিকৃত হয়) চোরাচালান বলা হয়। একই সঙ্গে বৈধ পথে কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বেআইনী আমদানি ও রফতানিকেও (স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণ রৌপ্যের অলংকার, মূল্যবান পাথর, বৈদেশিক মুদ্রা) চোরাচালান বলা হয়। চোরাচালান স্থল, সমুদ্র ও আকাশ পথে হয়। বিমান পথে চোরাচালান কম তবে স্বর্ণ ও অন্যান্য ওজনে কম অথচ মূল্যবান দ্রব্যাদি চোরাচালানের জন্য ব্যবহৃত হয়। চোরাচালান জাতীয় অর্থনীতিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেমন ১. চোরাচালান সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে দেশীয় শিল্পের বিকাশে। অধিকাংশ দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের উপর আবগারি শুল্ক রয়েছে। আভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে এ শুল্ক তুলে দেয়া সম্ভব নয়। অথচ চোরাচালানকৃত দ্রব্যের উপর কোন আমদানি শুল্ক দিতে হয় না। এ সুযোগে বিদেশী পণ্য দেশের বাজার দখল করে নেয়। ২. চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের ভেতরে আনা দ্রব্যের বিনিময়ে এমন অনেক দ্রব্য বিদেশে পাচার হয় যার অভাব দেশেও রয়েছে এবং যা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এটাও দেশের জন্য একটা ক্ষতির কারণ। ৩. চোরাচালানের ফলে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম ব্যাহত হয়। চোরাচালানকৃত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমদানির বিকল্প। ফলে এর বৈধ আমদানি কম হয় এবং রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হয়। ৪. চোরাচালান জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্যও হুমকিস্বরূপ। বিশেষ করে চোরাচালানীরা হিরোইন, মাদকদ্রব্য ও নিষিদ্ধ ঔষধ চোরাচালানকে লাভজনক মনে করে। এসব অবৈধভাবে আনা হয়ে থাকে। হিরোইন ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। চোরাচালান দেশের জন্য ক্ষতিকর বলেই ইসলাম একে নিষিদ্ধ করেছে।

১১. ক্ষমতা ও পদের প্রভাব খাটিয়ে অর্থোপার্জন ঃ ইসলাম তার রাষ্ট্রনির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য শুধুমাত্র ঘুষ নিষিদ্ধ করেছে তাই নয় বরং পদের প্রভাব খাটিয়ে কোন নির্বাহী, কর্মকর্তা বা

কর্মচারী কিছু উপার্জন করলে কিংবা কোন কর্মকর্তার পদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা কোন অর্থনৈতিক কিংবা অন্যকোন সুবিধাদি আদায় করা সেটাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা বড় প্রভাবশালী কর্মকর্তাকে খুশী রাখতে কিংবা তার কাছ থেকে অন্যায় ও অবৈধ কোন সুবিধা হাসিল করার জন্য তাঁকে বা তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে এ ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। ফলে এর দ্বারা সাধারণ জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। এসকল তদবীরবাজদের দৌরাত্ম্যের শিকার হয়ে আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অসহায় বনী আদম। এ কারণেই ইসলাম এ ধরনের আয়-উপার্জন ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকে হারাম করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণিত হযরত আবু হুমায়দ আস সায়েদী (রা) বর্ণিত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, ইবনে লুতাবিয়্যাহ নামক বনী আসাদের একজন সাহাবীকে মহানবী (সা) সাদাকাহ আদায়ের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি দায়িত্ব পালন শেষে এসে বললেন, এগুলো সাদাকার মাল, আর এগুলো আমাকে হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা) মিম্বারে উঠে বসলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আমিলদের কি হল যে, আমি তাদেরকে প্রেরণ করি, অতঃপর ফিরে এসে বলে, এগুলো রাষ্ট্রের, আর এগুলো আমার। সে তার বাবা মায়ের ঘরে বসে থাকল না কেন? তাহলে দেখা যেত যে, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? যার হাতে আমার প্রাণ; সেই সত্তার শপথ করে বলছি, এ ধরনের যা কিছু সে গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তার সমুদয় আপন স্কন্ধে বহন করে নিয়ে আসবে।'

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, পদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কোন কিছুই উপার্জন করা যাবে না এবং কোন সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য পদের প্রভাব কিছুতেই কাজে লাগানো যাবে না।

১২. প্রতারণা বা ছলনা ঃ প্রতারণা করা বা ধোকা দেয়া জঘন্য অপরাধ। এ প্রক্রিয়ায় অর্থ সম্পদ অর্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে ফাঁকি দিয়ে প্রতারণামূলকভাবে বা অসাধুভাবে ওই ফাঁকি দেয়া ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির কাছে কোন সম্পদ সমর্পণ করতে বা কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সম্মতি দান করতে প্ররোচিত করে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ ফাঁকি দেয়া ব্যক্তিকে এরূপ কোন কাজ করতে বা তা করা থেকে বিরত থাকতে প্রবৃত্ত করে যে সে কাজ অনুরূপভাবে ফাঁকি দেয়া না হলে করত না বা তা করা থেকে বিরত থাকত না

www.pathagar.com

এবং সে কাজ বা বিরতি ওই ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করে বা করার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ব্যক্তি প্রতারণা করেছে বলে গণ্য করা হবে। ৪১৫ ধারায় যে সম্পদের কথা বলা হয়েছে তা বস্তুগত বা অদৃশ্য সম্পদ বা সেবা হতে পারে। পণ্য দ্রব্যের নকল, ভেজাল, মুদ্রা, সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট ও অন্যান্য দলীল জাল করা এবং বিভিন্ন পেশার লোকের পোশাক পরে ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক অসদুদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা এবং এসবের মাধ্যমে বিত্ত-সম্পদ অর্জনও প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ের এমন সব পদ্ধতি যেখানে প্রতারণা ও চাপ প্রয়োগের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালিত হয় অথবা যেগুলোর মাধ্যমে কলহ, বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়– ইসলামী আইন এ ধরনের কাজকে হারাম গণ্য করে। প্রতারণার কারণে মানুষ ইসলামী আখলাক ও সচ্চরিত্র হারিয়ে ফেলে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা সম্পূর্ণ হারাম। একদিন মহানবী (সা) একটি খাদ্যের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, যাতে তিনি ভেজা অনুভব করলেন। তিনি খাদ্যের মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি ব্যাপার হে খাদ্যের মালিক? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, খাদ্যে পানি পড়েছে। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি ভেজালগুলো উপরিভাগে রাখলে না কেন, যাতে মানুষ দেখতে পেত। অতঃপর তিনি বললেন–

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا যে ধোকা দেবে এবং প্রতারণা করবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।[৩২]

১৩. হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ঃ ইসলামী শরীয়াত যেসব পণ্য দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছে তার উৎপাদন ও বিপণনকেও হারাম করে দিয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) মহানবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ। আল্লাহ যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন; তখন তার বিক্রয়লব্ধ উপার্জনকেও হারাম করে দেন।–আবু দাউদ।

হারাম দ্রব্যের ব্যবসা ইসলামে পরিত্যাজ্য। উদাহরণস্বরূপ শুকরের চর্বি, মাংস মিশ্রিত কিছু হারাম পণ্যের উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন–

১. Swine (সোয়াইন), Hog (হগ), Pig (পিগ) শূকরকে বলা হয়।

২. Bacon (বেকন), লবনতরিত শূকরের মাংস, Ham (হ্যাম), Sporkle (স্পোর্কল), Pork (পর্ক), Porker (পর্কার) শূকরের মাংসের বিভিন্ন নাম।

৩. Lard (লার্ড) শূকরের গলানো চর্বিকে বলে।

---

৩২. সহীহ মুসলিম, শরহে নববী ১২/২০৮

www.pathagar.com

৪. Gelloe (জেললো), Gelatin(জেলাটিন) এক জাতীয় তরল পদার্থ যার অধিকাংশ উপাদান হচ্ছে শূকরের চামড়া, হাড় ও ক্ষুর।

৫. Pepsin (পেপসিন) শূকরের রক্ত মিশ্রিত একটা ঔষধ।

৬. Aminal shortening (অ্যামিন্যাল শর্টেনিং) এবং L-Shortening (এল শর্টেনিং) দুটো তৈল যার দ্বারা সাধারণত খাবার পাকানো হয়। এগুলোর বিশেষ অংশ হচ্ছে শূকরের চর্বি।

পানাহার সামগ্রীর কিছু তালিকা যেগুলোর মধ্যে শূকরের চর্বি রয়েছে ঃ

১. Prince Chocolate (প্রিন্স চকলেট)

২. Kraft Cheese (ক্রাফট চিজি)

৩. Rammaak Cheese (র‍্যামাক চিজি) এ কোম্পানী দুটির পনির শূকরের দুধের বাচ্চার নাড়িভুঁড়ি দ্বারা তৈরী করা হয়।

৪. ইউরোপ ও আমেরিকার তৈরী অধিকাংশ বিস্কুট, প্যাস্টি ও রুটি শূকরের চর্বি মিশ্রণে তৈরী করা হয়।

৫. Pepsi Cola (পেপসি কোলা) এ প্রসিদ্ধ পানীয়টির মধ্যে Pepsin (শূকরের চর্বি মিশ্রিত একটি ঔষধ) মিশানো হয়।

৬. নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে Lard (শূকরের চর্বি) মেশানো হয়।

১. Camy soap (ক্যামি সোপ) ক্যামি সাবান।

২. Lux soap (লাক্স সোপ) লাক্স সাবান।

৩. Avery soap (অ্যাভরি সোপ) অ্যাভরি সাবান।

৪. Soap zict (সোপ যিকট) যিকট সাবান।

৫. Saif Guard (সেইফ গার্ড)

৬. Lata (লাটা)

৭. Liscap (লিসক্যাপ)।

৮. Bryl cream (ব্রাইল ক্রিম) চুলের ক্রিম।

এসব ব্যবহৃত সামগ্রী Kolgate (কোলগেট) এবং Plamleaf (প্লামলিফ) এ দুই কোম্পানীর তৈরী। কোলগেট এবং Borden Food (বর্ডেন ফুড) কোম্পানীর টুথপেস্টের মধ্যেও শূকরের চর্বি থাকে।

www.pathagar.com

ইউরোপ ও আমেরিকায় তৈরী মেয়েদের ব্যবহৃত Lipstick (লিপস্টিকের) মধ্যে শূকরের চর্বি মিশানো হয়।[৩৩]

শূকর ইসলামে হারাম। শূকরের মাংস, চর্বি, ক্ষুর, রক্ত, হাড্ডি, নাড়িভুঁড়ির মিশ্রণে তৈরী খাদ্য, পানীয়, ঔষধ, প্রসাধনী ইত্যাদি মুসলিমদের জন্য হারাম। তাই এইসব আমদানি, বিপণন ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এসব পণ্য মার্কেটিং এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হারাম বিবেচিত হবে। শূকরজাত বিদেশী পণ্য, বিলাস সামগ্রী অবশ্যই ঈমানদারদের বর্জন করতে হবে।

১৪. ভেজাল পণ্য বিক্রি করে আয় করা ঃ ভেজালকে আরবীতে বলা হয় আল গাশশুন, খিদাউন, মাকাবুন।[৩৪] উর্দুতে বলা হয়, ফারিবদিনা, দুহুকা দিনা।[৩৫] আর ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হলো- To cheat, Swindle, to double crass" to deceive, Fool, Delude, Bluff, Requile, to trick, Dupe, Gull.[৩৬] সংসদ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে প্রবঞ্চনা, ঠকামি, জুয়াচুরি, ছলনা, শঠতা ইত্যাদি।[৩৭] ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ভেজাল হল প্রত্যেক সে বস্তু বা কাজ যা তার মূলের বিপরীত।[৩৮] অর্থাৎ পণ্যের ত্রুটি গোপন করণ, কাজে প্রবঞ্চনা, আসলের বিপরীত করণই হলো ভেজাল। ইসলামে ভেজাল একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। খাদ্য-দ্রব্য বা যেকোন পণ্যে ভেজাল দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এসব পণ্য বিপণন করে আয়-উপার্জনও ইসলামে হারাম। অন্যকথায়- ভেজাল পণ্য বিক্রি করে আয় উপার্জন করা ইসলামে হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে।

---

৩৩. প্রফেসর আমজাদ সাকার (বৈরুত) এর একটি গবেষণা প্রবন্ধ সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকার কর্তৃক প্রচারিত হয়। এ প্রবন্ধের ভিত্তিতে শুকরের চর্বি ও মাংস মিশ্রিত হারাম পণ্যের তালিকাটি পাকিস্তানের প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা সিদ্দিকী ট্রাস্ট একটি ইশতেহার আকারে প্রকাশ ও প্রচার করে। বাংলাদেশে ইশতেহারটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করেন জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ জামে মসজিদের মুসল্লীবৃন্দ। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, রূহুল আমিন খান, নির্বাচিত কলাম, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ২৩১-২৩২

৩৪. আবু তাহের মেজবাহ, আল মানার (আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান) প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, পৃ. ৯১০।

৩৫. আবুল ফজল ও মাওলানা আঃ হাফিজ, মিসবাহুল লুগাত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, দিল্লী, পৃ. ১৯২।

৩৬. ড. রুবহু আল বালাবাক্কী, আল মাওরিদ (আরবী-ইংরেজি অভিধান), দশম সংস্করণ, বৈরুত, পৃ. ৮০৯।

৩৭. সংসদ বাঙালা অভিধান, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, পৃ. ৪৪৩।

৩৮. আদওয়াউ আশ শরীয়া জার্নাল, রিয়াদ, সংখ্যা ১৩, পৃ. ১১২।

www.pathagar.com

১৫. ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ঃ মালে ভেজাল মেশানো বা ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। অধিক মুনাফার লোভে উন্নত পণ্যের সাথে নিম্নমানের কোন পণ্য কিংবা মূল্যহীন কোন দ্রব্য মিশ্রিত করে বা কোন ক্যামিক্যাল মিলিয়ে উক্ত পণ্যের দরে বিক্রি করাকে বলে ভেজাল দেয়ার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়ার কারণে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। খাবারে ভয়াবহ ভেজাল মেশানোর বিষয়টি মোবাইল কোর্টের অভিযানে প্রমাণিত হয়েছে। চাল ও মুড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে ইউরিয়া সার। গরুর দুধে মেশানো হয় বিষাক্ত ফরমালিন। আইসক্রিম কারখানায় চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিষাক্ত সোডিয়াম সাইক্লামেট। ওয়াসার পানির সাথে সোডিয়াম সাইক্লামেট, টেক্সটাইলের রং, ফ্লেভার ও ক্যামিক্যাল মিশিয়ে তৈরী হয় জুস। তাতে তিল পরিমাণ ফলের রস না থাকলেও সেটি টাটকা ও তাজা ফলের জুস বলেই বিক্রি হচ্ছে। পাউরুটি, কেক, চানাচুর, পেটিস তৈরীর বেকারিতে ব্যবহৃত হচ্ছে বিষাক্ত রং, ক্যামিক্যাল, সোডিয়াম সাইক্লামেট, ইউরিয়া সার, মবিল, পচা ডিম ও গাদযুক্ত পোড়া তেল। মিষ্টির কারখানায় ব্যবহৃত হয় টেক্সটাইল মিলের রং, পঁচা ময়দা, হোয়ে পাউডার, সোডিয়াম সাইক্লোমেট ও দীর্ঘ দিনের জমানো গাদযুক্ত সিরা। পামওয়েল, গুড়ো হুইল পাউডার, গরুর চর্বি, রং দানা নামে বিষাক্ত কেমিক্যাল ও সেদ্ধ আলু পেস্ট করে মিশিয়ে তৈরী করা হয় নকল ঘি। সেই নকল ঘি-ই খাঁটি গাওয়া ঘি বলে চালিয়ে দেয়া হয়। কলা ও আম পাকানো হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে। ভোজ্য তেলের মিলগুলোতে সয়াবিন ও পামওয়েলের সঙ্গে বিষাক্ত কেমিক্যাল মাষ্টার ওয়েল মিলিয়ে তৈরী হয় নকল সরিষার তেল। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে দুই শতাধিক খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল চিহ্নিত হয়েছে।

১৬. ওজন ও পরিমাপে কম দিয়ে অর্থোপার্জন ঃ মাপ ও ওজনে কমবেশী করা তথা ওজনে কম দিয়ে অর্থোপার্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ওজনে কম দেয়া মূলতঃ ধোকাবাজি ও প্রতারণারই এক কৌশল। এর মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণকে ঠকানো হয়ে থাকে। এতে ক্রেতা তার অজ্ঞাতসারে ঠকে থাকেন। অথচ তিনি মনে করেন যে, তিনি তার প্রাপ্য পরিমাণই গ্রহণ করেছেন। এই অপরাধ কোন সমাজে বিদ্যমান থাকলে সে সমাজের ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম আস্থা হারাতে বাধ্য। এক চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে ক্রেতা সাধারণকে কেনাকাটা করতে হয়। এ জন্যই এ পন্থাকে কুরআনে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামে ইনসাফ সহকারে মাপের ও ওজনের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

www.pathagar.com

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ -

'ওজনে ন্যায্য মাপ প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপে কম দিওনা।' (৫৫ ঃ সূরা আর রাহমান ঃ ৯)

'ধ্বংস সেইসব ঠকবাজদের জন্যে, যারা অপর লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে কিন্তু তাদের ওজন বা পরিমাপ করে দেয়ার সময় কম দিয়ে থাকে।' (৮৩ ঃ সূরা আল মুতাফফিফীন ঃ ১-৩)

'(হে মানুষ, মাপের সময়) তোমরা পুরোপুরি মেপে দেবে, (মাপে কম দিয়ে) তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দলভুক্ত হয়ো না। (ওজন করার সময়) পাল্লা ঠিক রেখে ওজন করবে। মানুষের পাওনা কখনো কম দেবে না এবং দুনিয়ায় (খামাখা) ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না।' (২৬ ঃ সূরা আশ শোয়ারা ঃ ১৮১-১৮৩)

'তোমরা ঠিক ঠিক মতো পরিমাপ ও ওজন করবে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিওনা এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম হবে; যদি তোমরা মুমিন হও।' (৭ ঃ সূরা আল আরাফ ঃ ৮৫)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, মাপে কম দেয়া ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে তিল তিল করে অলক্ষ্যে চুরি করে এবং হারাম উপার্জন করে। যদি শ্রমিক কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয়, তাও মাপে কম দেয়ার আওতায় আসে। তেমনি কাজটা ঠিকমত করিয়ে নিয়ে শ্রমিক কর্মচারীকে উপযুক্ত বেতন না দেয়াও এর আওতায় আসে। কুরআনে উল্লেখ আছে, হযরত শোয়েব (আ)-এর সময়ে যারা ব্যবসা করত তারা ওজন ও পরিমাপে কম দিত। কিন্তু পণ্য সংগ্রহের সময় বেশী মাপে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করত অর্থাৎ তারা ঠকিয়ে লাভবান হতে চেষ্টা করত। এ অপরাধের জন্যে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে ঐ দেশে ভূমিকম্প দিয়ে সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

১৭. বেশ্যাবৃত্তি/পতিতাবৃত্তি ও ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন ঃ বেশ্যাবৃত্তি/পতিতাবৃত্তি পাশ্চাত্যে ব্যবসা হিসেবে পরিচিত। দেহ বিক্রি লব্ধ উপার্জনকে তারা খারাপ দৃষ্টিতে দেখে না। যারা অবৈধ যৌন কর্মের বা দেহদানের বিনিময়ে অর্থোপার্জন তথা বেশ্যাবৃত্তিতে জড়িত তাদেরকে যৌন কর্মী (Sex worker) বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামে বেশ্যাবৃত্তি/পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে ধনসম্পদ অর্জন হারাম। সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। ওটা একটা অশ্লীল কাজ এবং খারাপ পন্থা।' মানব সমাজকে মিশ্র প্রজাতি/কুমারী মাতা থেকে মুক্ত রেখে সুস্থ ও নির্ভেজাল

www.pathagar.com

বংশীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আল্লাহ ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন পতিতাবৃত্তি/বেশ্যাবৃত্তি এবং এর মাধ্যমে উপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছেন। এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বাড়ী ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন যে বাড়ীকে বেশ্যালয় বা রংমহলে পরিণত করবে, এটিও শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

১৮. অশ্লীলতা প্রসারকারী উপায় উপকরণের ব্যবসা ঃ

চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসা–

যেসব উপকরণ কোন নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে কিংবা সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়ায়; এ ধরনের সমুদয় পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং এর মাধ্যমে উপার্জন ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যেমন ঃ সিনেমার অশ্লীল ফিল্ম, অশ্লীল পর্ণো বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন ছবি সম্বলিত প্রচারপত্র ও পোষ্টার, যা দ্বারা নগ্নতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটে, অশ্লীল নাচ-গান সম্পর্কিত সিডি, ভিসিডি ইত্যাদি বিক্রির মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ এই মর্মে কুরআন মাজীদ ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

যারা মুমিনদের মাঝে (মিছে অপবাদ রটনা করে) অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। (২৪ ঃ সূরা আন নূর ঃ ১৯)

১৯. মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা ঃ ইসলামে মাদক দ্রব্যের মত ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার, উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণন এবং এর মাধ্যমে অর্থোপার্জন হারাম। সূরা আল মায়েদার ৯০ নং আয়াতে মদ হারাম করা হয়েছে। এ কারণে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে মদের কোন চাহিদাই সৃষ্টি হতে পারে না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা) বলেন, প্রত্যেক মাদক ও নেশাকর দ্রব্যই মদ এবং প্রত্যেক মদই হারাম। মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এমন যে কোন মাদক দ্রব্যই মদ। মহানবী (সা) এর কাছে মধু, ভুট্টা ও যব থেকে তৈরী মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি একটি মৌলনীতি ঘোষণা করেন এবং বলেন, সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই 'খামর'। আর সব খামরই হারাম।[৩৯] হযরত উমর ফারুক (রা) মহানবী (সা)-এর মিম্বরের

৩৯. সহীহ মুসলিম।

www.pathagar.com

উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন, যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে তাই 'খামর' এবং নিষিদ্ধ।[৪০] মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম– অল্প হোক কি বেশি। ইসলামে মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তার পরিমাণের উপর মোটেই দৃষ্টি দেয়া হয়নি। কাজেই তার পরিমাণ কম হোক কি বেশি, উভয় অবস্থায়ই তা হারাম। এ পিচ্ছিল পথে পা দিয়ে মানুষ যেন আছাড় না খায়, সে জন্যেই এ ব্যবস্থা। মহানবী (সা) স্পষ্ট করে বলেছেন, 'যে জিনিসের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার কম পরিমাণও হারাম।[৪১] যে জিনিসের কয়েক রতি পরিমাণও নেশাগ্রস্ত করে, তার অঞ্জলী ভরা পরিমাণও হারাম। ইসলামী ফিকাহর মূলনীতিতে বিধৃত ঃ 'মাদকদ্রব্য কম হোক বেশী হোক সম্পূর্ণরূপে হারাম। মাদকদ্রব্য হলো সকল অপকর্মের আধার।

ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রকার ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করেছে। মাদকদ্রব্যেরও যাবতীয় কুফল বর্ণনা করে এই মারাত্মক হলাহল সেবন ও ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের উপর জারি করেছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। মদ ছাড়াও কিছু তরল বা কঠিন আকৃতির মাদক দ্রব্য রয়েছে যা খেলে বা পান করলে মাদকতা আসে, বিবেক বুদ্ধি ও মেজাজ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে পাল্টে যায়, আংশিক অথবা পুরোপুরি মাতলামীর সৃষ্টি করে, মাত্রাতিরিক্তি যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে ব্যভিচারে প্ররোচিত করে, স্বভাবে হিংস্রতা এনে গালিগালাজ, মারামারি বা দাংগা-ফাসাদের উস্কানি দেয়, এমনকি মাত্রাতিরিক্ত সেবন করলে সেবনকারীর মৃত্যু ঘটে। মাদকাসক্তি একটি Social bad। এটি এমন এক সামাজিক ব্যাধি যা মহামারী আকার ধারণ করতে খুব একটা সময় লাগে না। মদ, গাজা, ভাং, আফিম, তাড়ি, হেরোইন, মরফিন, কোডেইন, পেথিড্রিন, ভেলিয়াম, সোনারিল, মেনড্রেকস, সিডাকসিন, পলিটামিন, এল এস ডি, মারিজুয়ানা, হাশিশ, ফেনসিডিল, চরস, কোকেন, হেম্প, ব্রাউন সুগার, স্মার্ক, ইয়াবা,[৪২] ঝাক্কি, এক্স এল মুড, আইসপিল, আইস ডব্লিউ ওয়াই,

---

৪০. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

৪১. জামে তিরমিযী, আবু দাউদ।

৪২. ইয়াবা এ সময়ের এক আলোচিত টেবলেটের নাম। এ এক মারাত্মক মাদক। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক 'ড্রাগস ইনফরমেশন' এর ওয়েবসাইটে বলা হয় ইয়াবা নামক মাদকটি হেরোইনের চেয়েও ভয়াবহ। ইয়াবা সেবন করলে শরীরে সাময়িকভাবে উদ্দীপনা বেড়ে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে কমতে থাকে জীবনী শক্তি। নিয়মিত ইয়াবা সেবনকারীদের মস্তিষ্ক বিকৃতি, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, হৃদরোগ, ক্ষুধামন্দা, নিদ্রাহীনতা ও খিচুনী দেখা দেয়। ইয়াবায় মেথামফিটাসিন এমপিটাসিন রয়েছে যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। ইয়াবা থাইল্যাণ্ড-মায়ানমার সীমান্তে উৎপাদন ও তৈরী

www.pathagar.com

এক্সাইটমেন্ট, এক্সটাসি, মেথামফেটাসিন, এলকোহল, ক্যানাবিস, মেসকালিন, সাইলেসোইবিন, এম ডি এম এ, ক্যাফিন, মৃতসঞ্জিবনী শূরা এবং অনুরূপ দেশী-বিদেশী বস্তু মাদক দ্রব্য এর আওতাভুক্ত। এ সবকটিই হারাম। তাই এসব ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থোপার্জনও হারাম। মহানবী (সা) মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যবসাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এমনকি অমুসলিমদের সাথেও এ ব্যবসা জায়েয নয়। কাজেই মদের বা মাদক-দ্রব্যের আমদানি বা রপ্তানি পর্যায়ের ব্যবসা করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয হতে পারে না। মদ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন বা বার খুলে বসা কোনটিই জায়েয নয়। মদের দোকানে চাকরি করাও সমানভাবে নিষিদ্ধ। এ কারণেই মহানবী (সা) মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে দশ ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ী ও মদ্যপায়ী ফাসিক ও অভিশপ্ত। সকল প্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে মাদকদ্রব্য। মাদক আর ঈমান একত্রিত হতে পারে না। তিরমিযি শরীফের হাদীসে আছে ১. মদের নির্যাস বেরকারী ২. প্রস্তুতকারক ৩. পানকারী ৪. পরিবেশনকারী ৫. আমদানিকারক ৬. যার জন্য আমদানি করা হয় ৭. বিক্রেতা ৮. ক্রেতা ৯. সরবরাহকারী ১০. লভ্যাংশ ভোগকারী- মদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ দশ শ্রেণীর লোকের উপর মহানবী (সা) লানত করেছেন।

সূরা আল আয়েদার ৯০ নং আয়াতে মদ হারাম করা হয়েছে। এ আয়াতটি যখন

হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে থাইল্যাণ্ডে এই মাদকটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের বড় একটা অংশ এ মরণ নেশায় জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে সেনাবাহিনীকে অভিযানে নামানো হয়। মিয়ানমার সীমান্তে মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে থাই সেনাদের বন্দুক যুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে। ২০০৪ সালে থাইল্যাণ্ডের তখনকার প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা ইয়াবা মাদককে তাঁর দেশের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি হিসেবে ঘোষণা করেন। এক পর্যায়ে 'ক্রস ফায়ারের' মত চরম ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। থাইল্যাণ্ডের গণমাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী ৪৯০০ (চার হাজার নয়শত) মাদক ব্যবসায়ী ও ইয়াবা বিক্রেতা-সেবীকে ক্রস ফায়ারে দেওয়া হয়। ১০ টার বেশী ইয়াবা যার কাছে পাওয়া যেতো তাকেই বিক্রেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। থাইল্যাণ্ড সরকার এ রকম কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার পর ইয়াবা ব্যাপকহারে বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। এই নেশায় আসক্তদের উপর পরিচালিত গবেষণায় জানা গেছে এটা সেবনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যৌন উত্তেজক ঔষধের মতো। তবে দীর্ঘদিন সেবনের পর যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এ কারণে দাম্পত্য সংকটের অনেক নজীরও আছে। (বিস্তারিত জানার জন্য প্রথম আলো, ২৫ অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যা পৃ. ১-১৩ দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

নাজিল হয় তখন মহানবী (সা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মদ পান হারাম করেছেন। কাজেই যেই এ হুকুম জানতে পারবে তার কাছে তার কিছু পরিমাণ থাকলেও তা পানও করতে পারবে না, তা বিক্রিও করবে না।[৪৩] হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় যার কাছে মদ মজুদ ছিল, তারা সকলেই তা মদীনার রাস্তায় প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন।

মদ পানের সব পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে, কোন মুসলমান যেন এমন কোন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রি না করে, যার সম্পর্কে জানা যাবে যে, সে এর দ্বারা মদ তৈরী করবে। হাদীসে বলা হয়েছে, যে লোক গাছ থেকে আঙ্গুর তুলে রাখাই করবে ইহূদী, খৃস্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে যে তা থেকে মদ তৈরী করবে, তাহলে সে জেনে শুনেই আগুনে ঝাপ দিল।[৪৪]

মদ বিক্রয় করা ও এ থেকে উপার্জন করে ভক্ষণ করাই মুসলমানদের জন্যে হারাম নয়, কোন মুসলিম ব্যক্তিই তা কিনে কোন অমুসলিমকে উপহার স্বরূপ দেওয়া, সম্পূর্ণ হারাম। তার জন্যও মাদকদ্রব্য উপঢৌকন হিসেবে আসতে পারে না। কেননা মুসলিমগণ পবিত্র। একজন মুসলিম পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু উপঢৌকন হিসেবে কাউকে দিতেও পারে না, সে নিজেও গ্রহণ করতে পারে না।

এক ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর খেদমতে হাদিয়া হিসেবে মদ পেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মহানবী (সা) তা জানতে পেরে তাকে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল আমি তা বিক্রি করে দেই। মহানবী (সা) বললেন, আল্লাহ তা পান করা যেমন হারাম করেছেন, তেমনি বিক্রি করাও। লোকটি বলল তাহলে কোন ইহূদীকে তোহফা হিসেবে দিয়ে দেই। মহানবী (সা) বললেন, যিনি তা পান করা হারাম করেছেন তিনিই তা কোন ইহূদীকে তোহফাস্বরূপ দেয়াও হারাম করেছেন। তখন লোকটি বলল, তাহলে আমি তা দিয়ে কি করবো। মহানবী (সা) বললেন, মদীনার রাস্তায় তা প্রবাহিত কর।

২০. মূর্তি বানানো ও বিপণন ঃ পূজার মূর্তি তৈরী এবং তা বেচাকেনা, মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা ইসলামে নিষিদ্ধ। (৫ ঃ সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০)

মহানবী (সা) বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَه। আল্লাহ যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন; তখন তার বিক্রয়লব্ধ উপার্জনকেও হারাম করে দেন। (আবু

৪৩. সহীহ মুসলিম

৪৪. তাবারানী

www.pathagar.com

দাউদ) এজন্যই মূর্তি তৈরী, মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় এবং মন্দিরের সেবার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ লাভের পন্থাকে কুরআন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

২১. ভাগ্য গণনার ব্যবসা ঃ কারো কষ্ঠী দেখে ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষের ব্যবসা ও শকুন বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবসা এবং এর মাধ্যমে আয়-উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা) ভাগ্য গণনা করে পাওয়া অর্থ ও হালুয়া বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি সব কিছুকেই নিষেধ করেছেন।

২২. জবরদখলের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ঃ জবরদখলের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যায়ভাবে কারো জমি বা সম্পদের উপর দখল বা আধিপত্য কায়েমই জবরদখল। ভূমি দস্যুতার মাধ্যমে তৈরী প্লট বিক্রি করা এ পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের পন্থায় সম্পদ উপার্জন সূরা আন নিসার ২নং আয়াতে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। জবরদখল যে নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে হাদীসেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে- مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ ভূমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, সাত স্তবক ভূমির সেই পরিমাণ তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে জবর দখলের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ যে অবৈধ হবে, তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এজন্য রাষ্ট্রকে ভূমিদস্যু, দালাল, মামলাবাজ সামাজিক দুর্বৃত্তচক্র ও জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৩. লুণ্ঠন কার্য ঃ লুট করে পাওয়া অর্থ বা লুণ্ঠনের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ অবৈধ। সম্পূর্ণরূপে শক্তি প্রয়োগে ও অত্যাচারের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে সম্পদ লাভ হয়। লুণ্ঠন কার্যের মাধ্যমে মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় অপরদিকে যার সম্পদ লুণ্ঠিত হল তার জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। একজন কঠোর পরিশ্রম করে সম্পদ উপার্জন করে আর লুণ্ঠনকারী লুট করে নিয়ে তা ভোগ করে। অনেক সময় লুণ্ঠনকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে ছিটকে পড়ে। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, 'মাদইয়ানবাসীরা সড়ক পথে গোপনে লুকিয়ে থেকে পথচারীদের মালামাল ছিনিয়ে নিতো এবং তাদের সর্বস্ব লুট করে নিতো।' ওদের মতো বর্তমানেও লুটের দলের তৎপরতা বিদ্যমান, যারা শরীয়াতের অসমর্থিত পথে

www.pathagar.com

বিভিন্ন অজুহাতে জোর-জবরদস্তি অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। এ ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে বিরাট পাপ ও জঘন্য অপরাধ।

২৪. ছিনতাই-রাহাজানি ঃ ছিনতাইকারীরা পথযাত্রীদের টাকা-পয়সা-স্বর্ণালংকার বিনিময় না দিয়ে নিয়ে যায়, আর তা নেয় পথিকের বুকে অস্ত্র ঠেকিয়ে, ভয় দেখিয়ে, ছিনিয়ে; তাই একে বলা ছিনতাই। ছিনতাই-রাহাজানির মাধ্যমে অর্থোপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় (ছিনতাই-রাহাজানি) তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে কিংবা (দেশ থেকে) তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের জন্যে, (তা ছাড়া) পরকালে তাদের জন্য ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই। (৫ ঃ সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৩)

২৫. যাদু মন্ত্রের ব্যবসা ঃ যাদু, জ্যোতিষ গণনা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থোপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। আরবীতে যাদুকে سِحْرٌ বলে। এর আভিধানিক অর্থ হল এমন প্রতিক্রিয়া যার কারণ অজ্ঞাত ও সূক্ষ্ম। পরিভাষায় যাদু হচ্ছে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-তুমার, গিট লাগানো, কথা, লেখা বা এমন কাজ করা যা বিবেক, মন ও শরীরের উপর পরোক্ষভাবে সত্যি সত্যি প্রভাব বিস্তার করে এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে কেউ মারা যায়, অসুস্থ হয়, বিবেক-বুদ্ধি হ্রাস পায় এবং তিলে তিলে ক্ষয় হতে থাকে। যাদু বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়, স্বামীর সাথে স্ত্রীর মনো-দৈহিক সম্পর্কে বাধার সৃষ্টি করে, ভালবাসা সৃষ্টি এবং একের প্রতি অন্যের বৈরীভাব তৈরী করে। যাদুকর নিজেই কারো ক্ষতি করে কিংবা কেউ তার কাছে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে কারো ক্ষতি করার তদবীর করে। হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-বৈরিতা ও হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যাদুর আশ্রয় নেয়া হয়। যাদুকে সাধারণ পরিভাষায় বান-টোনা বলা হয়। যাদুর উপকরণ বিভিন্ন। শরীরের চুল, হাতের নখ, চিরুনী, পরনের কাপড় ইত্যাদি। এগুলো তাবিজে পুরে বা রশিতে গিট লাগিয়ে বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র পড়া হয়। এ ছাড়াও দুর্বোধ্য রেখা এবং আঁকা- জোঁখার মাধ্যমেও তাবিজ করা হয়। পরে এগুলোকে পুকুর-নদী-সাগর-কূপ, ঘর কিংবা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এ ছাড়াও খাদ্য এবং পানীয়তে যাদুর মন্ত্র পড়ে বা কিছু কিছু মিশিয়ে তা খাইয়ে দেয়া হয়। যাদুর লক্ষ্য পূরণের জন্য শয়তানকে সন্তুষ্ট করতে হয়। বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র এবং শিরক-কুফরীর বাক্যাবলী অথবা শয়তানের প্রশংসাসূচক বাণী দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করা হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের আরাধনার মাধ্যমেও যাদুকর শয়তানকে

www.pathagar.com

সন্তুষ্ট করে। সাধারণভাবে যাদু হচ্ছে জিন শয়তানের কারসাজি। এতে তাবিজ-তুমারে ব্যবহৃত কোন কোন শব্দ ও বাক্যের প্রভাব থাকে। মেসমিরিজম তথা কল্পনা শক্তির ও প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে যাদুকর কাগজকে টাকায় রূপান্তর, কাউকে হত্যা করে আবার জীবিত করার মত অসাধারণ আচরণ প্রদর্শন করে। এ ছাড়াও যাদুতে বিশেষ কোন অক্ষর বা শব্দকে বিশেষ সংখ্যায় পাঠ করলে বা লিপিবদ্ধ করলে, কুফরী বাণী কিংবা কুরআনের কোন আয়াত ও সূরাকে উল্টো বা বিকৃত করে লিখলে বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যাদুর মাধ্যমে অর্থ, স্বাস্থ্য, সময়সহ সমাজ জীবনের বিরাট ক্ষতি হয়। তাই যাদু মানে ক্ষতি এবং যাদুকর হচ্ছে ঘৃণিত ও ক্ষতিকর। যাদুর প্রতিক্রিয়া হলে, ব্যক্তি কোন কিছু না করেই করেছে বলে ভাবে অথবা এর বিপরীত ভাবে; অর্থাৎ কোন কিছু করেও করেনি বলে চিন্তা করে। তা ছাড়াও যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি কষ্টবোধ করে। কুরআন পড়তে সক্ষম হয় না কিংবা পড়তে কষ্ট হয়, অনেক সময় প্রচণ্ড মাথা ব্যথা অনুভব করে যা সাধারণ মাথা ব্যথার চাইতে ভিন্ন। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বেশী বেশী কল্পনা করে এবং ভয় করে। কিন্তু ভয়ের কারণ জানে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অযৌক্তিক আচরণ করে ও রাগ করে এবং পরে লজ্জিত হয়।

ইসলামে সকল রকমের যাদুই হারাম। যাদুতে ক্ষতি ছাড়া কিছুই নেই। যাদু হচ্ছে কুফরী এবং কবীরা গুনাহ। যাদুতে শিরক ও গোমরাহীর সকল পথ অবলম্বন করতে হয়। যাদু একাধারে কুফরী, শিরক ও কবীরা গুনাহ। তাই এর মাধ্যমে অর্থোপার্জনও হারাম।

২৬. চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন ঃ চুরি আরবীতে সারাকা, ডাকাতি আরবীতে কাতউত তারীক নামে অভিহিত। কারো সংরক্ষিত মালামাল তার অজ্ঞাতে চুপিসারে নিয়ে যাওয়াকে সারাকা বা চুরি বলা হয়। চোর একজনের ধন তাকে বিনিয়ম না দিয়ে নিয়ে যায়। তবে মালিকের অগোচরে নিয়ে যায় বলে তাকে বলা হয় চুরি। আর অন্যায়ভাবে কারো সম্পদের উপর আধিপত্য কায়েম করাকে বলা হয় ডাকাতি। ডাকাত অপরের সম্পদ দাম না দিয়েই নিয়ে যায়; আর সেটা নেয় মালিককে বেঁধে রেখে তার সামনে থেকে; এ জন্য তাকে বলা হয় ডাকাতি। কাতউত তারিক বা এই উভয় পন্থায় মাল-সম্পদ উপার্জন প্রক্রিয়াকে আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অন্যের মাল অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না। (৬ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ১৯)

www.pathagar.com

এ আয়াতের অর্থের ব্যাপকতার মাঝে চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদও অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ সকল পন্থায়ও অন্যের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও চুরি ও ডাকাতি প্রতিরোধে ইসলাম যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, এ পন্থায় সম্পদ উপার্জন কিছুতেই বৈধ হবে না। আর এ জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দেয়া হল। চুরির শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا ـ

পুরুষ চোর ও মহিলা চোরের হাত কেটে দাও। (৫ ঃ সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৮)

ডাকাতির শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূপৃষ্ঠে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় (ডাকাতি করে), তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হবে কিংবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। (৫ ঃ সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৩)

চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি পন্থায় অন্যের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করা যে বৈধ নয় এ সম্পর্কে হাদীসেও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسِهِ ـ

কোন মুসলিমের মাল সম্পদ তার স্বতঃস্ফূর্ত সন্তুষ্টি ছাড়া কারো জন্য বৈধ হবে না। (ইবনে হিব্বান, আবু ইসহাক)

চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন দুনিয়ার কোন ধর্ম দর্শনেই বৈধ রাখা হয়নি। কেননা এতে একদিকে যেমন মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় অপর দিকে মানুষের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। একজন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সম্পদ উপার্জন করে, অন্যজন চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে তা নিয়ে ভোগ করে। এসব পন্থায় উপার্জনের পথ উন্মুক্ত থাকলে সমাজের উৎপাদন স্পৃহা হ্রাস পায়। কেননা যে উপার্জন বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, সে যদি সম্পদ ভোগ ব্যবহার করতে না পারে –এরূপ অবস্থায় পরিশ্রমী মানুষ উৎপাদনের প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। আর শ্রম নিয়োজিত না করেই সম্পদ হস্তগত করা যায় এ মনোভঙ্গীর কারণে চোর ডাকাতরা শ্রমদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ফলে সামগ্রিক অর্থনীতির উপর এর অশুভ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। অনেক সময় চোর ডাকাতদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেকের উৎপাদন পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

২৭. আত্মসাৎ ঃ ব্যক্তি ও সমষ্টি নির্বিশেষে আত্মসাৎ এর মাধ্যমে উপার্জন

www.pathagar.com

ইসলামে নিষিদ্ধ। পরের সম্পদ আত্মসাৎ অত্যন্ত ভয়ানক কাজ। পবিত্র কুরআনে এই দিকে ইঙ্গীত করে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামাতের দিন আত্মসাতের জিনিস সাথে নিয়ে হাজির হবে।

আত্মসাতকারী কিয়ামতের দিন নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হবে। সহীহ বুখারীতে আছে, মহানবী (সা) বলেছেন, 'কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহর বান্দাদের সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে। কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রয়েছে।'

২৮. চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয় ঃ চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থোপার্জন ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে চুরির মালামাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল।' (বায়হাকী)

২৯. আমানতের খিয়ানত করে সম্পদ উপার্জন ঃ খিয়ানত বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে অর্থ-সম্পদ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ আমানতদারী একটি মহৎগুণ। খিয়ানতের মাধ্যমে সমাজে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। কেননা নানা প্রয়োজনে একজনের সম্পদ অন্যজনের কাছে গচ্ছিত রাখতে হয়। কারো কাছে গচ্ছিত সম্পদ যদি যথাসময়ে ফেরত না পাওয়া যায় কিংবা যদি তা আদৌ না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে আমানতকারীর পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এ জন্যই আল্লাহ আমানতকে তার প্রাপকের নিকট প্রত্যর্পণের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আমানতের খিয়ানতকে ইহূদী বৈশিষ্ট্য হিসেবে কুরআন চিহ্নিত করেছে। খিয়ানত, চাই তা ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ হোক কিংবা জনগণের অর্থ-সম্পদ হোক, তা ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে।

৩০. ধাপপাবাজি ঃ ধাপপাবাজি, ধোকাবাজি করে অর্থ-সম্পদ অর্জন বা গচ্ছিত সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ভোগদখল ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী (সা) বলেন, ধাপপাবাজ-ধোকাবাজের স্থান জাহান্নামে। তিনি বলেন, কোন ধোকাবাজ জান্নাতে যাবে না। মহানবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি ধোকাবাজী করে সে আমার দলভুক্ত নয়। (সিহাহ সিত্তাহ)

পবিত্র কালামে মাজীদে আল্লাহপাক ধোকাবাজিকে মুনাফিকদের স্বভাব বলে অভিহিত করেছেন ঃ তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহকে ও মুমিনদেরকে ধোকা দিয়ে থাকে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো ধনসম্পদের ....ধোকা দেয় সে জাহান্নামী।'

www.pathagar.com

৩১. টেণ্ডারবাজি ঃ টেণ্ডারবাজি অত্যন্ত ঘৃণিত একটি কাজ। এ অবৈধ পন্থায় টেণ্ডার হাসিল করে বিত্ত-সম্পদ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। টেণ্ডারবাজি সাধারণতঃ ঠিকাদারদের পক্ষে করা হয়। ঠিকাদাররা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও গুণের সেবা বা সামগ্রী নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু অনেক সময় তারা এ চুক্তি পালনে ফাঁকি দেয় এবং চুক্তি অনুযায়ী যা প্রদেয় তা দেয় না। এতে তারা প্রচুর বিত্ত-সম্পদের মালিক হয়। ঠিকাদাররা চুক্তি অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন না করে যা উপার্জন করবে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না।

৩২. চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে উপার্জন করা ঃ পণ্যের গুণগতমান ভাল নয় তবুও নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থে চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের প্রতি নেশাময় প্রলোভন, আকর্ষণ সৃষ্টি ও মোহগ্রস্ত করে ক্রেতাদের সাথে প্রতারণা করে উপার্জন করা, পণ্যের দোষ গোপন করে বিক্রি করা, যে মানের পণ্য দ্রব্য দেয়ার কথা বিজ্ঞাপনে দেখানো হলো, তার চেয়ে নিম্নমানের পণ্য ক্রেতাকে দেয়া এবং এর মাধ্যমে লাভবান হওয়া ইসলামে অবৈধ। অসৎ ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে অত্যন্ত নিম্নমানের ও মেয়াদউত্তীর্ণ গুড়ো দুধ এনে চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাল মানের বলে চালিয়ে দেন। এ দুধই খাওয়ানো হয় শিশুদের।

৩৩. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ঃ দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। আইন ও সমাজে স্বীকৃত ধর্ম ও নীতি বিগর্হিত পথে অর্থসম্পদ, ক্ষমতা, পদ ও তৃপ্তি অর্জনকে দুর্নীতি বলে। দুর্নীতির আরবী হচ্ছে খাসাস। দুর্নীতির বিস্তার লাভ ঘটে দুটি কারণে। যেমন ১. দুর্নীতির সুযোগ থাকা-সহজে পার পেয়ে যাওয়া ২. মূল্যবোধের অবক্ষয়।

দুর্নীতি সকল ধরনের উন্নয়নের ঘোরতর প্রতিপক্ষ। ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। ভালমন্দ বিচার বোধের সীমাবদ্ধতা বা অক্ষমতা, ব্যক্তিগত অসৎ প্রবণতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার ব্যবহার সংক্রান্ত দ্ব্যর্থবোধকতা দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস। দুর্নীতি একটি মহাপাপ এবং শয়তান কর্তৃক নির্দেশিত মন্দ কার্য। কারো অর্থ-সম্পদ তার ইচ্ছা বা বিনিময় ছাড়া গ্রহণ করা, কিংবা বিনিময় দিয়ে ও রাজি করিয়ে অথবা বিনিময় ছাড়া রাজি করিয়ে নেয়া; এমনভাবে রাজি করিয়ে নেয়া, যে রাজি করানোর পেছনে দমনপীড়ন এবং চাপ প্রয়োগ থাকে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ ব্যবসায়িক সুবিধাগ্রহণ, অবৈধ সুবিধা বা ব্যবসায় অবৈধ মুনাফা অর্জনের প্রেক্ষিতে কমিশন লেনদেন, সুযোগ বুঝে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করা, স্বজনপ্রীতি (Nepotism),

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠজনপ্রীতি (Cronyism), আয়কর ফাঁকি দেয়া, আমদানী কর ও রপ্তানী কর ফাঁকি দেয়া, শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা না দেয়া অর্থাৎ শ্রমিককে কম দিয়ে –শ্রমিক শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা- এসবই দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থোপার্জন। অতি লোভী এবং দুর্নীতিবাজ এক শ্রেণীর লোক উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অর্থোপার্জন করে থাকে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

৩৪. ইয়াতীমের সম্পদের বল্গাহীন ভোগ ব্যবহার এবং তা থেকে উপার্জন ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল সম্পদ গ্রহণ করে, তারা যেন আগুন দিয়েই নিজেদের পেট ভর্তি করে, অচিরেই এ লোকগুলো জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। (৪ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ১০)

ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষ খেয়াল রাখবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ কিছু লোককে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন যে, তাদের পেট থেকে আগুন বেরুবে এবং তাদের মুখ থেকে আগুনের উদগীরণ হবে। জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! ওরা কারা। মহানবী (সা) বললেন, আল্লাহ পাকের এ কথাটি তুমি পড়নি যে, 'যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাত করে তারা পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভক্ষণ করে না?"

৩৫. সর্বপ্রকার জুলুমের মাধ্যমে অর্থ আয় ঃ জুলুম করে আয় রোজগার ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত। আরবী জুলুম শব্দটি গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক; জুলুম শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে কারো অধিকার হরণ করা। অর্থনীতিবিদ আকরাম খান বলেছেন, Zulum refers to all forms of inequality, injustice and exploitation. জুলুম করে অর্থোপার্জন এ জন্য নিষিদ্ধ যে এতে অপরের সম্পদ নিয়ে নেয়া হয় তাকে কোন বিনিময় না দিয়েই বা মাগনা। এতে সম্পদের উপর যার অধিকার ছিল তার অধিকার হরণ করা হয় এবং সম্পদের উপর যার অধিকার নেই সে সম্পদ হস্তগত করে; এটা অনধিকার চর্চা ও জুলুম।

৩৬. সন্ত্রাস ঃ সন্ত্রাসের মাধ্যমে উপার্জন ইসলামে অবৈধ। সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে পরদ্রব্য গ্রাস বা অন্যের সম্পদ হস্তগত করা বা অন্যকে কষ্ট দিয়ে উপার্জন মহানবী (সা) অনুমোদন করেননি।

৩৭. চাঁদাবাজি ঃ যারা চাঁদাবাজি করে তাদেরকে চাঁদাবাজ বলা হয়। চাঁদাবাজি ইসলামে নিষিদ্ধ। চাঁদাবাজরা জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে থাকে। চাঁদাবাজি এক ধরনের জুলুম। আল্লাহ বলেন, যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে

www.pathagar.com

অবৈধ বিদ্রোহ করে বেড়ায়, কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৪২ ঃ সূরা আশ শূরা ঃ ৪২)

এ আয়াতে যে জুলুমের কথা বলা হয়েছে চাঁদাবাজিও তার অন্তর্ভুক্ত। যারা জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করে তারা নিজেরা জুলুমবাজ এবং তারা জুলুমবাজদের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারীও। চাঁদাবাজরা যে চাঁদা আদায় করে, তা যেমন তাদের প্রাপ্য নয়, তেমনি যে পথে তা ব্যয় করে তাও বৈধ নয়। এ জন্যই মহানবী (সা) বলেছেন, অবৈধ চাঁদা আদায়কারী জান্নাতে যাবে না। (আবু দাউদ)

এর কারণ এই যে, 'অবৈধভাবে জোরপূর্বক চাঁদা আদায়কারী আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুম ও শোষণ চালায়। তাদের কষ্টার্জিত অর্থ কেড়ে নেয়, জোরপূর্বক চাঁদা যে আদায় করে, যে তার সহযোগিতা করে, যে সাক্ষী থাকে, তারা সবাই এ কাজের সমান অংশীদার। তারা সবাই হারামখোর।

৩৮. মাস্তানী ঃ মাস্তানীর মাধ্যমে অর্থোপার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। যে উপার্জন অন্যের কষ্ট কিংবা ক্ষতি বৃদ্ধি করে, সেই উপার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বলে গণ্য হয়। এক হাদীসে মহানবী (সা) স্পষ্ট করে বলেছেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং কারো ক্ষতিও করা যাবে না। (ইবনে মাজাহ)

৩৯. সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ঃ ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে কুটিল কারসাজির মাধ্যমে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা হস্তগত করে, এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যের হক এভাবে হস্তগত করার দায়ে আখেরাতে তো বিপর্যয় আসবেই, দুনিয়াতেও এর কুফল দেখা দেয় মারাত্মকভাবে। দুনিয়ার কুফল বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন–

১. এতে ক্রেতা সাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।

২. গুটি কয়েক ব্যবসায়ী অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ হরণ দ্বারা পুঁজিপতি হয়ে উঠে এবং এতে করে সম্পদ বন্টনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

৩. এতে স্বয়ং ব্যবসায়ীরাই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের অসদাচরণ সম্পর্কে ক্রেতাগণ যখন অবহিত হবে, তখন ব্যবসায়ের সুনাম (Good will) নষ্ট হবে, যা পুরো ব্যবসাতেই বিপর্যয় আসতে পারে। এ সুনাম (Good will) ব্যবসায়ের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (Asset)। ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট হওয়ার দরুন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের চাহিদা বাঁ দিকে স্থানান্তরিত (Shift) হয়, ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪০. মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থোপার্জন ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে মধ্যস্বত্বভোগী বলে একটি গ্রুপ আছে। এর মানে হল মূল বিক্রেতা ও ক্রেতার

www.pathagar.com

মাঝে মধ্যস্থতা (দালালী, মিডলম্যান, রিসেইলার) করে এক শ্রেণীর লোক অর্থ উপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে পণ্যের প্রকৃত মূল্য ও মার্কেট প্রাইস বা ভোক্তাদের ক্রয় মূল্যের মাঝে বিস্তর তফাৎ সৃষ্টি হয়। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা না থাকলে ভোক্তারা যে মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া দামে তাদেরকে পণ্য ক্রয় করতে হয়। এতে সাধারণ ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে ভোক্তাদেরকে বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্ছা দিতে হয়। এ কারণে ইসলাম এহেন প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না; বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটি মূলনীতি হচ্ছে, সম্পদ উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ উপার্জন। হারাম উপার্জনের কারণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত ও দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না বরং নাফরমানী হয়।

এগুলো শোষণমূলক এবং রাতারাতি অর্থ কেন্দ্রীভূত করার ম্যাকানিজম। এসব অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে ব্যক্তির হাতে সম্পদের পাহাড় জমে উঠে। এসব কর্মকাণ্ড বা পন্থার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। কোন ব্যক্তির আয় রোজগার যদি অবৈধভাবে হয় তবে তার কাছ থেকে সমাজ ও দেশ মহৎ কিছু তো দূরে থাক, ভাল কিছুও আশা করতে পারে না। সে অবৈধ উপার্জনকারী ব্যক্তি বরং সমাজের দুষ্টক্ষত। ক্রমেই যদি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে দেশের ও জাতির রাজনৈতিক আদর্শ যতই উত্তম হোক না কেন তার অধঃপতন অবধারিত। তাই ইসলামে আয়ের ক্ষেত্রে বৈধতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ বা হারাম করে দেয়া হয়েছে সব ধরনের অবৈধ বা হারাম পথে আয়। একজন মুসলিমের আয়-উপার্জন অবশ্যই হালাল বা বৈধ পন্থায় হতে হবে। কোনক্রমেই অবৈধ উপায়ে উপার্জন করা চলবে না। মহানবী (সা) সব হারাম ও অনৈতিক পথে উপার্জন কঠোরভাবে রোধ করেছেন। তৎকালীন সময়েই শুধু নয়, বর্তমান যুগেও অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এত ব্যাপকভাবে অবৈধ ও অশ্লীল উপায়ে উপার্জনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। এ কারণেই সেসব মতাদর্শে সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। যে সমাজে নৈতিক দিক দিয়ে আয়ের অবৈধ পন্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই সে সমাজে শুধু আইন প্রয়োগ করে কোন সাফল্য অর্জিত হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

www.pathagar.com

হারাম উপায়ে উপার্জন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

হারাম উপায়ে উপার্জন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। যেমন–

প্রথমতঃ অবৈধ আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুলুম করা হয়। হয়রানী করে বা কৌশলে প্রতারণা করে অথবা বাধ্য করে লোকদের নিকট থেকে ব্যক্তি বিশেষ বা অনেক সময় শ্রেণী বিশেষ উপার্জন করে থাকে। এতে জনগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি সমাজে সৃষ্টি হয় অসন্তোষ। উপরন্তু কলহ, বিশৃঙ্খলা, বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ চরিত্র হননকারী, চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিষয়। যেমন– নৃত্য, সঙ্গীত, মদ, বেশ্যাবৃত্তি সব ধরনের অশ্লীল কাজ ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ। এসব করে আয় উপার্জনও তাই নিষিদ্ধ। সমাজে এসব কাজের এতটুকুও প্রশ্রয় দিলে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও কলুষতা ছড়িয়ে পড়বে। এর বিষবাষ্প প্রবেশ করবে সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ফলে চরিত্র হননের প্রসার ঘটবে। গোটা সমাজ পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত হবে। এ জন্যই এসবের মাধ্যমে উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ সাধারণতঃ অবৈধ কাজেই ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ব্যয়ের অর্থই হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও পংকিলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অবৈধ ও অসৎ উপায়ে যারা আয় উপার্জন করে থাকে তারা সে আয় নানা সমাজবিরোধী তথা ইসলামী অনুশাসন বিরোধী কাজে ব্যয় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নাচ-গান, সিনেমা, নানা রং তামাশা, বিলাস-ব্যসন, মাদকাসক্তি, বেশ্যাগমন, লিভটুগেদার, রংমহল বানানো, ব্যয়বহুল প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরী প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর যে কোন একটিই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। যদি এর সবগুলোই কোন সমাজ বা জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনুপ্রবেশ করে তাহলে গোটা সমাজ ও জাতির চূড়ান্ত সর্বনাশ হবে। এজন্যই মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (সা) অবৈধ উপায়ে উপার্জনের সকল পথ রুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, হারাম উপায়ের উপার্জনে তৈরী রক্ত মাংস জাহান্নামের খোরাক হবে।

যদি কোন ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে কোন অর্থ উপার্জন করে, তাহলে তার উচিত যত দীর্ঘ সময়ই তা তার দখলে থাকুক না কেন, এর প্রকৃত মালিককে অথবা তার উত্তরাধিকারীকে তা ফেরত দেয়া। প্রকৃত মালিকের সন্ধান কোন ক্রমেই পাওয়া

www.pathagar.com

না গেলে ঐ অর্থ প্রকৃত মালিকের পক্ষে কোন জনহিতকর কাজে দান করে দেয়া উচিত।

যদি কোন ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে অর্থ পায় তার উচিত ঐ অর্থ কোন জনহিতকর কাজে ব্যয় করা। ঐ অর্থ কোন ক্রমেই অর্থ প্রদানকারীকে ফেরত দেয়া যাবে না।

সুদী কারবারের মত হারাম কারবারে জড়িত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দেয়া যাবে না। এরূপ অর্থ জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে।

অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ এর মালিককে ফেরত দেয়া সম্ভব না হলে এর বদলে সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে হবে। এর প্রকৃত মালিক জানা সম্ভব না হলে ঐ অর্থ প্রকৃত মালিকের পক্ষে জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে।[৪৫]

খ. ইসলামে ব্যয়ের নীতিমালা

ব্যয়ের কুরআনিক পরিভাষা হচ্ছে 'ইনফাক'। প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যয় করা, যে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে 'ইনফাক' বলে। কুরআনে 'ইনফাক' সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

লোকেরা আপনাকে কী ব্যয় করবে (ইনফাক) সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; আপনি বলুন, যা ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথচারী মুসাফিরদের জন্য। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫)

লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত তা। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা থাকে। আল্লাহ যাকে চান এরূপ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১)

যারা আল্লাহর পথে ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২৬২)

---

৪৫. ২৯ শে মার্চ ১৯৯৪ ইং বাইরাইনে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়ামে প্রদত্ত ফতওয়া। উদ্ধৃত যাকাত নির্দেশিকা, আল হেলাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা (২০০৭) পৃ. ১২২-১২৩।

www.pathagar.com

শোন হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ব্যয় করবে তোমাদের অর্জিত উত্তম বস্তু থেকে এবং তা থেকে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই; কিন্তু তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার মনস্থ করবে না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

যারা নিজেদের ধন-দৌলত রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্য ফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৪)

যারা লোক দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না, শয়তান কারো সাথী হলে সে সাথী কতনা মন্দ। (৪ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ৩৮)

আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। তারা ছোট কিংবা বড় যা-ই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ্ তার চাইতে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদের দিতে পারেন। (৯ ঃ সূরা আত তাওবা ঃ ১২১)

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন। (৯ ঃ সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। মানুষ তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ তিনটি পন্থায় ব্যবহার করে। যেমন–

১. মওজুদ বা সঞ্চয় করে;

২. বিনিয়োগ (Investment) করে;

৩. ব্যয় বা খরচ করে।

অর্থ-সম্পদ নিশ্চল সঞ্চয় বা জমা করে রাখাকে ইসলাম পছন্দ করেনি। হালাল পন্থায় লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা বা ব্যবসা করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

অর্থ-সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয়

উপার্জিত অর্থ বৈধ পন্থায় ব্যয় করা ইবাদত। বৈধ পন্থায় ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা।

২. স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করা

www.pathagar.com

৩. পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের জন্য ব্যয় করা।

৪. ফরজ, ওয়াজিব ও নফল অবলিগেশনসমূহ পূরণে ব্যয় করা

ফরজ-ওয়াজিব-নফল obligation সমূহ		
ফরজ	**ওয়াজিব**	**নফল**
যাকাত	সাদাকাতুল ফিতর	সাদাকাতে নাফেলা
কাফফারাত	নাফাকাত	ওয়াকফ
ফিদিয়া	নজর-মানত	ওয়াসিয়াত
মোহর	আকীকা	জারাইর
	কুরবানী	মিনাহ

৫. সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজে ব্যয় করা

৬. অভাবী-দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা। ইসলাম বলছে c = y (s+I),। অর্থ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ।

(y = Income, c = Consumption, s = Savings, I = Infaq-fi-Sabilillah)

৭. এরপরও সম্পদ থাকলে এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তার সম্পদ ইসলামী মীরাসী আইন অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে। একজনের মালিকানা তার জীবনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তার ইনতিকালের পর সে সম্পদ ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তার ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক নীতিমালা

১. অল্পে তুষ্টি ঃ ইসলামী ভোক্তার পছন্দ নৈতিকতা, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ভোগ আচরণকে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা পন্থা হিসেবে গণ্য করে। অল্পে তুষ্টি ভাল। অনর্থক লালসা ভাল নয়। অনর্থক লালসার একমাত্র ফলাফল দুঃখ ও বঞ্চনা। অতিরিক্ত জীবনোপকরণ সংগ্রহের নাম সুখ নয়, সুখের সম্পর্ক মনের সাথে। মহানবী (সা) বলেন, 'সফল সে ব্যক্তি যে ইসলামের পথ পেয়েছে এবং তার মোটামুটি রিযিকও

আছে আর সে তাতে তৃপ্তও।[৪৬] হযরত আলী (রা)-এর মতে, হায়াতে তাইয়্যেবা বা পরিচ্ছন্ন জীবনের অনুসঙ্গ হচ্ছে কানাআত বা অল্পে তুষ্টি।

২. সহজ সরল জীবন যাপন ঃ সহজ সরল জীবন যাপন ইসলামী মাকাসিদের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে মানুষ, জীবন যাপন করতে হবে সহজ সরল সাদাসিধাভাবে। কোন প্রকার ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও অনৈতিক জীবন স্টাইল ইসলাম অনুমোদন করে না। শরীয়ার লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেককে সহজ, সরল ও বিনীত জীবন যাপন তথা সুশৃঙ্খল নেক জীবনের অধীন করে সকলের ফালাহ বা কল্যাণ নিশ্চিত করা। মহানবী (সা) জীবন ধারায় সহজ সরল ও অনাড়ম্বরভাবে চলার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদেরকে বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা প্রদানের জন্য আল্লাহ্ আমাকে অহী মারফত জানিয়েছেন যাতে কেউ অন্যের প্রতি কোন অন্যায় করতে না পারে এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে না পারে।[৪৭] কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের জন্য সাদাসিধে জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, অসার দম্ভ এবং সম্মানের বৈষয়িক প্রতীকের জন্য সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে একের অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা হারাম।[৪৮]

৩. মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ঃ একজন ইসলামী ভোক্তা ভোগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হতে হলে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। মহানবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না।'

ব্যয়ের ক্ষেত্রে নেতিবাচক নীতিমালা ঃ যা পরিহার করতে হবে–

১. ইসরাফ [Overuse] ঃ অপচয়, অপরিমিত ব্যয়, অতিরিক্ত পানাহার করা, বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু ব্যয় করা, নষ্ট করা (wastage)। ইসরাফ হলো হালাল খাতে এমন ব্যয় যা প্রয়োজনাতিরিক্ত। হালাল সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা। যদি কোন বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত করা হয়; তখন সেটা ইসরাফ হয়। অন্যকথায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই সেটা ইসরাফে পরিণত হয়। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় 'ইসরাফ' অর্থ

---

৪৬. সহীহ মুসলিম, তিরমিযী।

৪৭. সুনানু আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ১৯৫২, পৃ. ৫৭২

৪৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আশ শায়বানি, কিতাব আল কাসব, ভলিউম ৩০, পৃ. ২৬৬-২৬৮।

www.pathagar.com

সীমা অতিক্রম করা বা অপচয় করা। মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই অপচয় করছে। কাজ না করে সময়ের অপচয় করছে, জিনিসপত্রের সঠিক ব্যবহার না করে অপচয় করছে। পানাহারে বা ভোগবিলাসে অতিরিক্ত ব্যয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থবাদী ভোগবাদী জীবনধারার অনুসরণ ফুটে উঠে। ইসরাফ না করার নীতির ব্যাপক ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের তাৎপর্য রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি একটি নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভোক্তাগণ তাদের নিজ নিজ মাসয়ালা অনুসরণ করার অজুহাতে ইসরাফের কবলে পড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ নিজেদের উদর পূর্তি করতে গিয়ে গরীব ও অসহায় প্রতিবেশীর কথা ভুলে যেতে পারে। সামাজিক পর্যায়ে ইসরাফ সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, বন্টননীতি এমনভাবে তৈরী হতে হবে, যাতে সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে 'ইসরাফ' উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তিপর্যায়ে ইসরাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকার নিজেও ইসরাফ পরিহার করবে। ব্যয়ের ইসলামী নীতিতে তাই আদর্শও কাম্য।

২. তাবজীর [Mis-use] অপব্যয় ঃ হালাল সম্পদ হারাম কাজে ব্যয় করা, অশ্লীল কাজে ব্যয় করা, ইসলামের ক্ষতি সাধনে ব্যয় করা। কোন বস্তুকে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যয় না করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করলে, হারাম খাতে ব্যয় করলে, অপব্যবহার করলে, সেটাকে বলা হয় তাবজীর। ইসরাফের তুলনায় তাবজীরের ক্ষতি ব্যাপক। এজন্যই তাবজীরকারীদের শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। (১৭ ঃ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৭)

অবৈধ উপার্জন হতে অবৈধ খাতে ব্যয়ই শুধু নিষিদ্ধ নয়; হালাল উপার্জন হতেও অবৈধ খাতে ব্যয় নিষিদ্ধ। এজন্যই ইসলামে তাবজীরকারী বা অপব্যয়কারীকে পছন্দ করা হয় না। অপব্যয়ের ছিদ্রপথেই সংসারে আসে অভাব অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। এজন্য অপব্যয় বা তাবজীর ইসলামে অপরাধ।

৩. বুখল [Non-use] কৃপণতা ঃ সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহার না করা। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা অবলম্বন করা অত্যন্ত দূষণীয়। কৃপণতা মানুষের একটি মন্দ স্বভাব। ইসলামী জীবন বিধানে কৃপণতার কোন স্থান নেই। কৃপণতা ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। বরঞ্চ তা সময়ের ক্ষতিই করে থাকে। ইমাম গাজ্জালী (রহ) বুখল বা কৃপণতার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন–

www.pathagar.com

১. লালসা ও প্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করণের স্পৃহাই কৃপণতার প্রধান কারণ।

২. দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কামনাও কৃপণতার আরেকটি কারণ।

৩. সন্তান-সন্ততি এবং পরিবার-পরিজনও কৃপণতার অন্যতম কারণ। সন্তান-সন্ততির জন্য ধনসম্পদ রেখে যাওয়াকে অনেকে নিজের স্থায়িত্ব মনে করে; এ কারণে কৃপণতা দোষ তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে উঠে।

৪. ধনাসক্তিও কোন কোন সময় কৃপণতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কৃপণ ব্যক্তি হয় অত্যধিক লোভী। তারা ধন-সম্পদ কেবল জমা করতে থাকে। এ সম্পদ না তাদের নিজের কাজে লাগে, না অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় হয়। তারা কেবল প্রাচুর্যের হিসাব করে জীবন অতিবাহিত করে। ইসলামে বুখলকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলাম কৃপণকে পছন্দ করে না। কৃপণতা বড় ধরনের অপরাধ। ইসলামী অর্থনীতিতে বুখল নীতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, অতিরিক্ত খরচ যেমন পছন্দনীয় নয়, তেমনি কৃপণতাও গ্রহণযোগ্য নয়। সম্পদ জমিয়ে রাখলে তার উৎপাদনশীলতা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার আবর্তন হয় না। এজন্য ইসলামে বুখল পরিহার করে সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

গ. প্রবৃদ্ধি, বণ্টন ও কল্যাণ

অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উঁচু হারই যথেষ্ট নয়। দেশের জাতীয় আয়ের বৃহদাংশ যদি গোটা কয়েক ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, তবে ব্যাপক জনগণ উচ্চ আয়ের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। দেখা যায়, অনেক দেশেরই জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় অনেক বেশী। কিন্তু তা মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিশিষ্ট অর্থনীতি গবেষক এণ্ড্রু হেকার দেখিয়েছেন, পৃথিবীর মাত্র কয়েশ' বৃহদায়তন কর্পোরেশন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮০% আর্থিক কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র ১০ ভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আয় ও সম্পদ বণ্টনের এ আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রকট দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করার পরিণাম সম্পর্কে একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, 'বেসরকারী পুঁজিপতিদের ঋণদানের ক্ষমতা তাদের হাতে এত বেশী সম্পদ ও ক্ষমতা তুলে দেয় যে, তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অবশিষ্ট

www.pathagar.com

জনগণের স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।' ফলে দেশের ব্যাপক জনগণ দুঃখ-দুর্দশার শিকার হন। তারা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হন না। সুতরাং অত্যন্ত উঁচু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও এসব দেশ জনকল্যাণ করতে পারে না। পঞ্চাশ ও ষাট এর দশক পর্যন্ত উন্নয়ন বলতে 'জাতীয় অর্থনীতির সামর্থ্য'কেই বিবেচনা করা হতো। দেশে বসবাসরত দশতলা আর গাছতলার লোকদের মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের একটা বাস্তব চিত্র আঁকা হতো। সম্প্রতি অনেক অর্থনীতিবিদ সে ধারণা থেকে সরে এসে বলেছেন, 'সম্পদের কতটুকু উৎপাদিত হলো সেটাই শেষ কথা নয়। সেই সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।' দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন বলেছেন, 'দুর্ভিক্ষের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা দায়ী নয়, সম্পদের উপর মানুষের অধিকারহীনতাই দুর্ভিক্ষের কারণ।'

এ জন্যই কুরআন বলছে, যেন ধন-সম্পদ শুধুমাত্র বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জিভূত না হয়।'[৪৯] ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ অর্জন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব তার চেয়ে বেশী। সম্পদ মুষ্টিমেয় বিত্তবানদের হাতে পুঞ্জিভূত না করে তা সমাজের বেশীর ভাগ মানুষের কাজে লাগানোর ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ জন্যই সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ও সঞ্চালনে ইসলাম জোর দিয়েছে। ইসলাম আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন, সুযোগের পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। কুরআন বলছে, তোমাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[৫০] হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, চাষবিহীন অবস্থায় কোন জমি অনধিক তিন বছরের অধিক ফেলে রাখা যাবে না।

অতএব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জনগণের মধ্যে আয় ও ধন-সম্পদের যুক্তিসংগত বণ্টনও অপরিহার্য। প্রবৃদ্ধির সঙ্গে এখানেই মূল্যবোধের গাঢ় সমন্বয় সাধিত হয়। এ মুল্যবোধের প্রেক্ষিতে সমকালীন বিশ্ব প্রধানতঃ দু'টি

---

৪৯. ৫৯ ঃ সূরা আল হাশর ঃ ৭, এ আয়াতের মর্ম অনুসারে ইসলামী অর্থনীতিতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অসহায় ও অভাবগ্রস্তদের মঙ্গলের জন্য তাদের মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক তহবিল বা অর্থের বরাদ্দ থাকতে হবে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে ইসলামী সমাজে প্রবৃদ্ধি ও সমতার দ্বৈত লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হবে।

৫০. ৫১ ঃ সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯।

www.pathagar.com

মতাদর্শে বিশ্বাসী। একটি মতবাদ সম্পদ বণ্টনের প্রশ্নটিকে স্বাধীনভাবে বাজার শক্তির [Market forces] উপর ছেড়ে দেয়। এ অর্থনীতিকে Free Economy বা স্বাধীন অর্থনীতি বলে। এ মতবাদের অনুসারী দেশগুলোতে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং জনগণের সীমাহীন ভোগান্তি পরিলক্ষিত হয়। এ মতবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আরেকটি মতবাদ জন্ম লাভ করেছে। তাতে অর্থ ও সম্পদ বণ্টনে পুরো সাম্যের নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির অনুসারী দেশগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি [Centrally Planned Economy] বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এসব দেশে সাম্য অর্জিত হয়নি, অথচ মানুষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়েছে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে প্রচুর।[৫১] আবার কল্যাণের সংজ্ঞা এবং উপাদান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্তমান দুনিয়ার বস্তুবাদী অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তবু মানব কল্যাণের জন্য কয়েকটি উপাদান অপরিহার্য বলে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত পোষণ করেন। এ উপাদানগুলো হচ্ছে–

১. সর্বাধিক উৎপাদন [Optimum production] নিশ্চিত করা;

২. যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষতাপূর্ণ তথা সকল কর্মক্ষম মানুষের যথোপযুক্ত ব্যবহার/সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; [Full employment of human and material resources, opportunity to earn an honest living to every body]

৩. আয় ও সম্পদের সুষম ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা; [Equitable distribution of income and wealth]

৪. সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান; [Fulfilment of the basic material needs of all individuals]

৫. সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা। [Ensure total social security and peace]

৬. সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেকের সুযোগের লভ্যতা [Availability to everyone of an opportunity to earn an honest living]

৭. দারিদ্র্য দূরীকরণ [Elimination of poverty]

৮. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ [Universal brotherhood]

---

৫১. ড. এ. এইচ. এম. সাদেক, ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টন, থটস অন ইসলামিক ইকনমিক্স, ভলিউম ৭, নং ২, ১৯৮৬, পৃ. ৪৪।

www.pathagar.com

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন মানব কল্যাণের জন্য উল্লেখিত অপরিহার্য লক্ষ্যসমূহ হাসিল করতে হলে প্রধানতঃ দু'টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক ঃ

১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সসীম সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহার;

২. আয় ও সম্পদের সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা।

ইসলামী অর্থনীতিও এ ব্যাপারে সচেতন যে, মানব কল্যাণের জন্য যেমন যথেষ্ট আয় ও সম্পদ প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তিসংগত বণ্টন দরকার। তবে এ নীতি চরমতার উর্ধ্বে। ইসলাম একটি স্বভাব-সুন্দর প্রকৃতি সংগত কল্যাণময় জীবন বিধান। এ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই ইসলামের বণ্টন নীতি দেয়া হয়েছে।

অসমতা ও বণ্টন

এটি ধ্রুব সত্য যে, সমাজে বসবাসরত সকল ব্যক্তি বা পরিবার সমান আয় বা সম্পদের মালিক নয় বা সকলে সমান পরিমাণ আয় ও সম্পদ অর্জন করতেও পারে না।[৫২] কারণ প্রত্যেকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সুযোগ সমান নয়। যারা দক্ষ, যোগ্য, কুশলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর তারা অবশ্যই বেশী আয় ও সম্পদ অর্জনে সক্ষম হবে কিন্তু যাদের যোগ্যতা ও সুযোগ কম তারা আয় ও সম্পদ অর্জনে পিছিয়ে থাকে। তদুপরি প্রতিটি সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা প্রত্যেক উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণে অসমর্থ। ফলে কার্যগত বণ্টন ব্যবস্থায় কোন হিস্যা বা অংশ [Share] পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেছনেই পড়ে থাকে। এ সমস্ত কারণে পুঁজিবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক পৌরণিক কিংবা আধুনিক, গণতান্ত্রিক কিংবা একনায়কতান্ত্রিক সকল অর্থনীতিতে, সকল যুগেই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, পরিবারে-পরিবারে, আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন চলে আসছে।[৫৩]

তবে বৈষম্যের ব্যাপ্তির [Extent of Inequality] দিক বিচার করে আয় ও সম্পদের অসম বণ্টনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. আয় ও সম্পদের স্বাভাবিক অসম বণ্টন [Normal inequality in distribution].

২. আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসম বণ্টন [Abnormal inequality in distribution].

৫২. ডি. কে. মুরথে, ইকনমিক ডেভলপমেন্ট এণ্ড ইনকাম ডিষ্ট্রিবিউশস, ১৯৯২, পৃ. ২।

৫৩. ডি কে মুরথে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

www.pathagar.com

১. আয় ও সম্পদের স্বাভাবিক অসম বণ্টন

ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্ম দক্ষতার পার্থক্যের কারণে কিংবা ইসলামের মীরাসী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের কারণে আয় ও সম্পদ বণ্টনে যে অসমতা তাকে স্বাভাবিক অসম বণ্টন [Normal inequality] বলে। এ ধরনের অসমতা ইসলামে গ্রহণযোগ্য। কুরআন বলছে ঃ

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط

তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? মোটেও না। বরং আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অন্যের কাজ নিতে পারে। (সূরা ৪৩ ঃ আয যুখরুফ ঃ ৩২)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْأَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ط

যদি আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। (৪২ ঃ সূরা আশ শূরা ঃ ২৭)

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে পুরোপুরি সমতা ইসলামের বাধ্যতামূলক বিধান নয়।

আসলে তা বাস্তব বলেও মনে হয় না। কারণ সকলের উপার্জন ক্ষমতা ও প্রচেষ্টা সমান নয় এবং উপার্জিত ধন অন্যায়ভাবে হরণ করার অনুমতিও ইসলামে নেই। তদুপরি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তি দ্বারা অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল ব্যক্তিদের ধন দানের ব্যবস্থাই সম্পদ বণ্টনে আপেক্ষিক পার্থক্য অনুমোদিত হওয়ার ইঙ্গিত বহণ করে।[৫৪]

২. আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসম বণ্টন

ইসলাম ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসমতাকে অকল্যাণকর ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে। আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসমতা

৫৪. ড. এ. এইচ. এম. সাদেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

www.pathagar.com

বলতে সম্পদ ও সুযোগে মদদপুষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে আয় ও সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ এবং অন্য পক্ষের রিক্ত হস্ততা বুঝায়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নির্দেশনা হলো–

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ ط

যেন ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে পুঞ্জিভূত না হয়। (৫৯ ঃ সূরা আল হাশর ঃ ৭)

এখানে আয় ও সম্পদ বণ্টনে সুস্পষ্ট মূলনীতি পাওয়া যায়। সম্পদ গুটি কয়েক ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকুক, ইসলাম তা কোনমতেই সমর্থন করে না। এর মানে, সম্পদ সমাজের জনগণের মধ্যে বণ্টিত হতে হবে।

এ আয়াতের তাৎপর্য হলো দক্ষতা, প্রচেষ্টা, স্বাস্থ্য ও মেধাশক্তির মাপকাঠিতে একের সাথে অপরের পার্থক্য থাকবেই এবং এর ফলস্বরূপ আয়ের তারতম্য হবেই; তাই বলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল বৈষম্যের সৃষ্টি হোক ইসলাম তা অনুমোদন করে না। কারণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসম বণ্টন অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যেমন–

১. একদিকে দেশের ব্যাপক জনগণ মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়; অন্যদিকে বিত্তবানরা বিলাস ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেয়। সমাজের সাধারণ মানুষ শোষিত-বঞ্চিত-সর্বহারায় পরিণত হয়।

২. ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য যত বাড়ে অর্থনৈতিক কল্যাণ তত কম হয়। গরীব জনগণ ক্রয় ক্ষমতার অভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে না, তাদের চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। গরীব ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা কম থাকা বা না থাকার কারণে পণ্য সামগ্রীর কার্যকর চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যায়। ফলে উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিরাট অংশের বিপণন অনিশ্চিত পড়ে থাকে। লর্ড কীনস দেখিয়েছেন, আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসমতার কারণে শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের লক্ষণ জনগণের থাকে না বিধায় শিল্প উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

৩. আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসম বণ্টন শুধুমাত্র ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানই বাড়ায় না বরং উৎপাদন, ভোগ, আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

ইসলামের বণ্টন নীতি

ইসলামী অর্থনীতিতে আয় বণ্টনের নীতি সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত। ইসলামে সম্পদ বণ্টনের তিনটি বিধান ও মূলনীতি বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

১. যে যা উপার্জন করে, তা তারই প্রাপ্য।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো ঃ 'পুরুষ যা উপার্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা উপার্জন করে সেটা তার অংশ। (৪ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ৩২)

ইসলামী অর্থনীতিতে কোন প্রকার ভেদাভেদ না করে নারী ও পুরুষ সকলকেই যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়। এ নীতি শুধুমাত্র পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে নয় বরং সকল উপকরণের (মানুষ কিংবা অন্য কোন উপকরণ) জন্যও প্রযোজ্য।

এখান থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, হালাল উপায়ে যে ধন ও সম্পদ উপার্জন করা হয়, উপার্জনকারী তার অধিকারী হবে। কোন ব্যক্তি যদি অধিক পরিশ্রম দ্বারা যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে এবং তা কাজে লাগিয়ে হালাল উপায়ে অধিক উপার্জন করে, সে তার অধিকারী হবে। অপর দিকে কেউ যদি অলস সময় কাটায় এবং পরিশ্রম বিমুখ হয়, তবে সে স্বভাবতঃই কম উপার্জন করবে। উপার্জনের মাধ্যমে এ কম পরিমাণই তার প্রাপ্য। আর এটাই হলো আদল বা ন্যায় বিচারের দাবী।

"মানুষ তাই পাবে, যার জন্য সে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে।" (৫৩ ঃ সূরা আন নাজম ঃ ৩৯)

২. একের উপার্জিত ধন অন্যায়ভাবে অন্য কেউ নিতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো ঃ

"তোমরা একে অন্যের ধন বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না।" (৪ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ২৯)

বাতিল পন্থায় অন্যের ধন-সম্পদ গ্রাস করার অর্থ হচ্ছে বিনিময় না দিয়ে কারো সম্পদ নিয়ে যাওয়া। সুদ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ, ধোকা, প্রতারণা, ঠগবাজি, জুয়া, লটারী, জবরদখল ইত্যাদি সবই হচ্ছে পরের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি। বাতিল মানে হচ্ছে যার কোন ভিত্তি নেই; আর বাতিল পন্থায় মানে হচ্ছে বিনিময় ছাড়া গ্রহণ করা।[৫৫]

---

৫৫. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে অর্থনীতি, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। ১৯৯০ পৃ. ৪৯৫-৯৬

www.pathagar.com

৩. হীনবল-দুর্বলদের সহায়তা করা।

যারা অপেক্ষাকৃত অধিক সচ্ছল তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছলদেরকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য। অন্যকথায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল ব্যক্তিগণকে অর্থ ও ধন প্রদান করবেন। ইসলামী অর্থনীতিতে শুধুমাত্র দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের কল্যাণের জন্য তাদের মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক তহবিল ও অর্থের বরাদ্দ থাকতে হবে। এ নীতি বাস্তবায়নের ফলে ইসলামী সমাজে প্রবৃদ্ধি ও সমতার দ্বৈত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভবপর হবে।

আয় ও সম্পদ বন্টনের নিম্নমাত্রা

ইসলামী অর্থনীতিতে সকল জনগনের মৌলিক চাহিদা মেটাবার যোগ্য আর্থিক সঙ্গতি বাধ্যতামূলক। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী বন্টন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মর্যাদাসম্পন্নভাবে সকলের মৌলিক চাহিদা মেটাবার নিশ্চয়তা বিধান করবে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক। এগুলোর ব্যবস্থা করতে যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজন ন্যূনপক্ষে তা সকলেরই থাকতে হবে। এখান থেকেই সম্পদ বন্টনের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। অন্যকথায় দেশে বিদ্যমান বন্টন ব্যবস্থার দরুন সবচেয়ে কম সম্পদশালী বা গরীব ব্যক্তির যে আয় ও সম্পদ থাকবে সেও অধিক সম্পদশালী ব্যক্তির সমমানে মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারবে। কমপক্ষে তার ততটুকু সামর্থ্য থাকতে হবে।

আয় ও সম্পদ বন্টনে এ উচ্চ ও নিম্নমাত্রার মধ্যে ইসলামী বন্টন ব্যবস্থার প্রবল প্রবণতা হবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং সমমুখী। অন্যকথায়, ইসলাম সমমুখী বন্টন [Equitable distribution] বাস্তবায়ন করতে চায়।

সমমুখী বন্টন পদ্ধতি

একটি সমমুখী বন্টন নীতি দিয়েই ইসলাম নিরব থাকেনি। বরং এ বন্টন নীতি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী কর্মসূচী ও পদ্ধতি দেয়া হয়েছে।

দু'পদ্ধতিতে আয় ও সম্পদ বন্টন

সাধারণতঃ দু'টি পদ্ধতিতে আয় [Income] ও সম্পদ [Wealth] বণ্টিত হয়। যেমন–

www.pathagar.com

ক. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন [Functional Distribution of Income].

খ. হস্তান্তরজনিত বণ্টন [Distribution of Income by Transfer].

ক. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন

প্রতি বছর দেশের যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপন্ন হয়, তাকে জাতীয় আয় [National Income] বলে। এ আয় উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। এ বণ্টনকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন বলে।

কোন দ্রব্য যখন উৎপন্ন হয়, তখন এ উৎপাদনে চারটি উপাদান তাদের নিজ নিজ অবদান রাখে। সেগুলো হলো– ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন। উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা যাই উৎপন্ন হয়, তা এ চারটি উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হয়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভূমি পায় খাজনা, শ্রম পায় মজুরী, আর মূলধন পায় সুদ। এ তিনটি উপাদানকে নির্ধারিত প্রাপ্য দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার অধিকারী হয় সংগঠন। ভূমি, শ্রম ও মূলধনের প্রাপ্য নির্ভর করে এদের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক শক্তির উপর। এখানে বণ্টনজনিত মূল্যবোধের বালাই খুব কম। উৎপাদনের উপাদানসমূহের সরবরাহ যদি চাহিদার তুলনায় বেশি হয় তাহলে তাদের মূল্য হবে কম। সেক্ষেত্রে এদেরকে কম পারিশ্রমিক দিয়ে অবশিষ্ট পুরোটাই সংগঠক নিয়ে যায়। এতে করে শোষণের সৃষ্টি হয়। এর ফলে আয় ও সম্পদ গোটা কয়েক ব্যক্তির নিকট কুক্ষিগত হতে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এভাবেই ধন বণ্টনে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন

সমাজবাদী অর্থনীতিতে শ্রম ছাড়া অন্য কিছুকে উৎপাদনের উপাদান বলেই স্বীকার করা হয় না। অথচ এ অর্থনীতিতে শ্রমকেও তার অবদান অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়ার পর অবশিষ্ট সবটুকু রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কুক্ষিগত হতে থাকে।

এভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কয়েকজন ধনীর পকেটে আয় ও সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়। আর সমাজবাদী দেশে তা কেন্দ্রীভূত হয় রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে। সুতরাং সমকালীন এ দু'টি মতবাদই ব্যাপক বণ্টনের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন

ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বণ্টন হলো ব্যাপক বণ্টনের অনুকূলে। উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টনের যে নীতি ইসলাম দিয়েছে, তাতে তা কেন্দ্রীভূত না হয়ে ব্যাপকভাবে বণ্টিত হয়। সকল উপাদানের অবদান অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যাদি বণ্টিত হওয়া ন্যায়বিচারের দাবী। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা এ ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন বার বার ঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ ন্যায়বিচার ও ইহসানের নির্দেশ দিচ্ছেন।" (১৬ ঃ সূরা আন নাহল ঃ ৯০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– "ধ্বংস তাদের জন্য যারা ওযনে ও পরিমাপে কম দেয়। যারা লোকদের নিকট থেকে যখন কিছু ওযন করে নেয়, তখন পুরোটাই নেয়; আর যখন কিছু অন্যকে মেপে বা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়।" (৮৩ ঃ সূরা আল মুতাফফিফীন ঃ ১-৩)

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, উৎপাদনের উপাদানসমূহ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে অবদান রাখে, তা যদি পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়, অথচ এর যথাযোগ্য মূল্য দেয়া না হয়, তবে তা হবে অন্যায়; আর যারা এমনভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহকে ঠকায়, তাদের জন্য আল্লাহর অভিশাপ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি উপাদানকে তার অবদান অনুযায়ী মূল্য দিতে হবে। বলাবাহুল্য, উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদানকে যদি তার অবদান অনুযায়ী মূল্য দেয়া হয়, তবে উৎপন্ন দ্রব্য গোটাকয়েক পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জিভূত হতে পারবে না।

www.pathagar.com

ইসলামে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা

- সম্পদ বণ্টনে ধনাত্মক বিধান (Distribution of Income by Positive Transfer)
  - উৎপাদন প্রক্রিয়ার বণ্টন
    - ভূমির প্রাপ্য
    - শ্রমের প্রাপ্য
    - মূলধনের প্রাপ্য
    - সংগঠনের প্রাপ্য
  - হস্তান্তরজনিত বণ্টন
    - জনগণের নিকট থেকে জনগণের নিকট হস্তান্তর
    - সরকারের নিকট হতে জনগণের নিকট হস্তান্তর
      - প্রাকৃতিক বণ্টন পদ্ধতি
      - সংশোধনমূলক ব্যবস্থা
        - বাধ্যতামূলক হস্তান্তর
          - যাকাত
          - ওশর
          - কাফ্ফারাত
          - ফিদিয়া
          - মোহর
        - ওয়াজিব হস্তান্তর
          - সাদাকাতুল ফিতর
          - নাফাকাত
          - নজর
          - উদহিয়্যা
          - আকীকা
        - ঐচ্ছিক হস্তান্তর
          - সাদাকাতে নাফেলা
          - হিবা
          - ওয়াকফ
          - ওয়াসিয়াত
          - জারাইর
          - মিনাহ
- সম্পদ বণ্টনে ঋণাত্মক বিধান (Distribution of Income by Negative Transfer)

www.pathagar.com

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন

১. ভূমির প্রাপ্য

ভূমি আল্লাহ প্রদত্ত উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপকরণ। সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে পৃথিবীর উপরিভাগকে বুঝায়। প্রচলিত অর্থনীতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদকেই ভূমি বলা হয়। এ বক্তব্য অনুযায়ী জমি, উর্বরা শক্তি, খনিজ সম্পদ, বায়ূ ও পানির উপাদানসমূহ সবই ভূমির অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, 'ভূমি বলতে সেই সব সম্পদ এবং শক্তিসমূহকে বুঝায় যা জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত এবং যা মানুষের সাহায্যার্থে স্রষ্টা উপহার দিয়েছেন।'

ইসলামী অর্থনীতিতে ভূমির সংজ্ঞা ভিন্নতর। রূপান্তর না করে বা সম্পূর্ণ নিঃশেষ না করে যে জিনিসকে ভাড়ার ভিত্তিতে উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যায় তাই ভূমি। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ভূমি উৎপাদিত ও অনুৎপাদিত উভয় প্রকার হতে পারে। যেমন এক খণ্ড জমি। এ জমিকে ভাড়ার ভিত্তিতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। এ ব্যবহারের ফলে জমি নিঃশেষ হয়ে যায় না। এ সংজ্ঞানুযায়ী মেশিনারী ভূমির অন্তর্ভুক্ত। কারণ মেশিনকে ভাড়ার ভিত্তিতে উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়, এতে মেশিনটি নিঃশেষ হয়ে যায় না। তবে তার ক্ষয় হতে পারে। অন্যকথায় পুনঃব্যবহারযোগ্য ও ভাড়াযোগ্য সব ধরনের সম্পত্তি ভূমির অন্তর্ভুক্ত। মেশিনারীর মত মূলধনও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এখানে সম্পত্তি অথবা সম্পত্তির সেবার দাম নির্ধারণ করা যায়। ভূমির প্রাপ্য ভাড়া বা Rent হচ্ছে মালে গায়রে ফানি[৫৬] বা Non Fungible goods এর ব্যবহার বা সেবার দাম। ভাড়া পূর্ব নির্ধারিত হয়। ভাড়ার বিনিময় হচ্ছে সমমূল্যের সেবা। ভূমির প্রাপ্য ভাড়া পূর্ব নির্ধারিত হলেও ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।

---

৫৬. পৃথিবীতে দু'ধরনের পণ্য সামগ্রী ও বস্তু আছে; মালে ফানি বা Fungible Goods এবং এবং মালে গায়রে ফানি বা Non Fungible Goods. ফানজিবল গুডস বলতে এমন পণ্যকে বুঝায় যা নিঃশেষ না করে তা থেকে উপকারিতা [Benefit] লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন– টাকা, খাদ্য-সামগ্রী ইত্যাদি। এ ধরনের পণ্য একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ বা রূপান্তর হয়ে যায়; এসব পণ্যের সেবা প্রবাহ নেই; পণ্যের সেবাটা সার্ভিসকে পণ্য থেকে পৃথক করা যায় না। মালে গায়রে ফানি বা নন ফানজিবল গুডস [Non Fungible Goods.] কাউকে ব্যবহার করতে দিয়ে ফেরত নেয়া যায়, পণ্যটি নিঃশেষ বা রূপান্তর হয় না। অন্যকথায় যেসব সম্পদ বার বার ব্যবহার করা সত্ত্বেও বর্তমান থাকে এবং যার ব্যবহার থেকে উপকার পাওয়া যায়, সেগুলো Non Fungible Goods. যেমন- বাড়ী, ফ্ল্যাট, গাড়ী, মেশিনারীজ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

২. শ্রমের প্রাপ্য

শ্রম উৎপাদনের একটি মৌলিক উপাদান। মানুষের যে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ অর্জন করা যায় প্রচলিত অর্থনীতিতে তাকে শ্রম বলে। অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন পরিশ্রম প্রচলিত অর্থনীতিতে শ্রম নয়। মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে ইসলামে শ্রম বলে। এ অর্থে কোন কোন শ্রমের অর্থনৈতিক বিনিময় নাও থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত প্রতিবেশীর সেবা, দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর থাকা, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর নেয়া ইত্যাদি ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞানুযায়ী শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমের ধারণা গতানুগতিক অর্থনীতির ধারণার চাইতে অনেক ব্যাপক। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর মতো বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। শ্রম হচ্ছে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের একটি অবিচ্ছেদ্য শক্তি বা গুণ। সুতরাং মানুষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত বা বিক্রিত হতে পারে না। শ্রমকে তার অধিকারী থেকে আলাদা করা যায় না। এ জন্য কাউকে শ্রম দিতে হলে স্বয়ং শ্রমের অধিকারী মানুষটাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হয়।

শ্রমের প্রাপ্য হচ্ছে মজুরী। একজন শ্রমিককে তার দৈহিক ও মানসিক শ্রম দানের বিনিময়ে চুক্তি মোতাবেক দেয় অর্থকে মজুরী বলে। উৎপাদকের নিকট মজুরী হলো উৎপাদন খরচ, আর শ্রমিকের নিকট মজুরী হলো আয়।

শ্রমিককে তার যোগ্য প্রাপ্য দেয়ার জন্য ইসলাম কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। এক হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ বলেন, তিনি কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাদের মধ্যে একজন হলো সে ব্যক্তি, যে অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করে পুরো কাজ আদায় করে নিলো, কিন্তু তার যোগ্য প্রাপ্য দিল না।" (সহীহ্ বুখারী)

সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু বাজার শক্তি [Market forces] এর মাধ্যমেই শ্রমের দাম নির্ধারিত হবে না বরং শ্রমের উপযুক্ত অংশ তাকে দিতে হবে। সে অংশ থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না।

তদুপরি ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিককে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। উৎপন্ন দ্রব্যে শ্রমিক তার অবদানের জন্যই শুধু পারিশ্রমিক পাবে না বরং সংগঠকের ভাই হিসেবেও সহানুভূতিপূর্ণ বিশেষ সুবিধার দাবীদার হবে।

রাসূলে পাক (সা) বলেন– "তোমাদের অধীনস্থ শ্রমিকগণ তোমাদেরই ভাই।

www.pathagar.com

সুতরাং তোমরা যা খাবে, তাকে তাই খেতে দাও। আর তোমরা যেমন কাপড় পরিধান করবে, তাদেরকে তেমন কাপড়ই পরতে দাও।"

লক্ষ্য করার বিষয় যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের নির্দিষ্ট অবদান নির্বিশেষে সংগঠকের সমমানের খাবার ও পরিধেয় বস্ত্র শ্রমিককে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শ্রমিকের অবদান যদি এর চেয়ে কম মূল্যবান হয়, তবু তাকে ন্যূনপক্ষে শিল্পপতির সমমানের খাওয়া-পরার সামগ্রী দিতে হবে। এটি মনে হয় খাওয়া-পরার কথা বলে এখানে জীবনের মৌলিক চাহিদার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রমিককে এমন পারিশ্রমিক দিতে হবে, যাতে করে সে শিল্পপতির সমমানের দ্রব্যাদি দিয়ে মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে।

উপরোল্লেখিত হাদীস থেকে শ্রমিকের আর্থিক পারিশ্রমিকের [Money wage] নিম্নতর হার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের পারিশ্রমিক [Money wage] ন্যূনপক্ষে এমন হবে যে, তা সমমানের মৌলিক চাহিদা মিটাবার মতো প্রকৃত পারিশ্রমিকের সমান হয়। এছাড়া প্রকৃত মজুরী [Real wage] এর আরো কতগুলো উপকরণের নিশ্চয়তাও এতে দেয়া হয়েছে। এসব উপকরণের মধ্যে সাধারণতঃ কাজের ভার, কাজের পরিমাণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা) বলেন– "তোমরা শ্রমিককে এমন কাজের ভার দিও না, যা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়। যদি তাদেরকে এমন কাজের ভার দাও, তাহলে তুমি নিজেও সে কাজে অংশগ্রহণ করে তাকে সাহায্য কর।"

নিয়োগকারী কাজে অংশগ্রহণ করলে দু'টি লাভ হবে। এক. শ্রমিকের কাজের ভার ভাগ হবে। দুই. নিয়োগকারী শ্রমের গুরুভার সম্পর্কে আঁচ করতে পারবে। ফলে শ্রমিকের কাজের ভার সম্পর্কে সে সচেতন হবে।

এভাবে আর্থিক ও প্রকৃত [money and real] পারিশ্রমিক সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ ও মূলনীতি দেয়া আছে। শ্রমিককে যদি এ মূলনীতি অনুযায়ী তার প্রাপ্য দেয়া হয়, তবে শ্রমিক শোষণ দেখা দেবে না। আর এ শোষণ যদি না হয়, তবে শিল্পায়নের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টনে পুঁজিতান্ত্রিক বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারবে না।

৩. মূলধনের প্রাপ্য

উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূলধন। মূলধন হল সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, মুলধন গঠন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। অন্যকথায় মূলধন হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তকরণ এবং মূলধন গঠন হলো প্রবৃদ্ধি অর্জনের ইনজিন

www.pathagar.com

(Capital is the heart of economic development and capital formation is the engine of growth) উৎপাদন কার্যে বা ব্যবসায়ে যে অর্থ ব্যবহৃত হয় ইসলামী অর্থনীতিতে তাকেই মুলধন বলে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত দালান, কোঠা, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং যে অর্থ বা টাকা দিয়ে উৎপাদনের এসব উৎপাদিত উপাদান সংগ্রহ করা হয় সে অর্থ বা টাকাকে মূলধন বলে। ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত উৎপাদিত সামগ্রী এবং অর্থের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেমন– উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত দালান কোঠা, যন্ত্রপাতিকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে ভাড়া দেয়া যায়। কিন্তু অর্থ বা টাকাকে নির্দিষট হারে ভাড়া দেয়া যায় না, কারণ তা হবে সুদ। ইসলামে সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামী অর্থনীতিতে মূলধনের প্রাপ্য নির্ধারণে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের নীতি অনুসৃত হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে মূলধনের প্রাপ্য নির্ধারিত হয়। মূলধন খাটিয়ে যদি লাভ হয়, মূলধন সে লাভের অংশ পাবে, আর যদি ক্ষতি হয়, মূলধনই সে ক্ষতি বহন করবে। মূলধনের প্রাপ্য নির্ধারণে এ হচ্ছে ইসলামী মূলনীতি। এটিই হল ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা। কেননা লাভের সময় মূলধন যদি লভ্যাংশ পায়, ক্ষতির সময় তাকে ক্ষতির ভারও বহন করা উচিত। এ ব্যবস্থা সুদের কুফল থেকে মুক্ত।

প্রচলিত অর্থনীতিতে মূলধনের অধিকারীকে নামমাত্র সুদ দিয়ে সংগঠক গোটা মুনাফা আত্মসাৎ করে নেয়। এতে করে যে আপামর জনগণ ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখে, তারা লগ্নিকৃত মূলধনের উপযুক্ত অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদেরকে ঠকিয়ে শিল্পপতিরা টাকার কুমির হয়ে বসে। অপরদিকে ব্যাংক আমনতকারীরা ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

ইসলামী অর্থনীতিতে সংগঠক ও সাহেব আল মাল বা মূলধন প্রদানকারীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী বণ্টনের যে মূলনীতি দিয়েছে, তাতে লভ্যাংশ বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে না। লাভ-ক্ষতি এবং লাভের পরিমাণ নির্বিশেষে মূলধন প্রদানকারীকে পূর্ব নির্ধারিত শতকরা হারে লভ্যাংশ দিতে হয়। ফলে, মুনাফা যদি বেশি হয়, তবে তা বণ্টিত হয়ে যায়। আবার মুনাফা যদি কম হয় বা লোকসান হয়, তবে তাও তাদের মধ্যে বণ্টিত হতে পারে। এতে করে ক্ষতির বোঝাটি যেমন বণ্টিত হতে পারছে, তেমনি মুনাফাও পুঞ্জিভূত না থেকে বণ্টিত হতে পারে।

www.pathagar.com

৪. সংগঠনের প্রাপ্য

ব্যবসায়ের কোন প্রকার ঝুঁকি বহন না করে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে একত্রিত করে উৎপাদন কার্য সমাধা করা এবং ব্যবসা পরিচালনা করাকে ইসলামী অর্থনীতিতে সংগঠন বলে। ইসলামী অর্থনীতিতে সংগঠন ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে না। যদি লাভ হয় তবে মূলধন ও সংগঠনের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত শতকরা হার অনুযায়ী সে মুনাফা বণ্টিত হয়। যদি ক্ষতি হয় তবে পুরো ক্ষতিই মূলধনের। সংগঠক শুধু নিজ পারিশ্রমিক হারায়। মুদারাবা, মুশারাকা বা শিরকত বিনিয়োগ ম্যাকানিজমে মূলধন ও সংগঠনের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের ইসলামী নীতি "সমমুখী বণ্টনে" অত্যন্ত সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

মোটকথা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টন [Functional distribution of income] দ্বারা ইসলামী অর্থনীতিতে সমমুখী বণ্টনের নিশ্চয়তা রয়েছে। এতে করে অর্জিত অর্থ শিল্পপতিদের নিকট পুঞ্জিভূত না হয়ে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে যুক্তিসংগতভাবে বণ্টিত হয়।

হস্তান্তরজনিত বণ্টন

হস্তান্তরজনিত বণ্টন দু'প্রকার। যেমন–

১. জনগণের নিকট থেকে জনগণের নিকট হস্তান্তর

২. সরকারের নিকট হতে জনগণের নিকট হস্তান্তর

জনগণের নিকট থেকে জনগণের নিকট হস্তান্তর

এ হস্তান্তর আবার দু'প্রকার। যেমন–

১. প্রাকৃতিক বণ্টন পদ্ধতি

২. সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

সংশোধনমূলক ব্যবস্থা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন–

ক. বাধ্যতামূলক হস্তান্তর [Compulsory Transfers]

খ. ওয়াজিব হস্তান্তর [Wajib Transfers]

গ. ঐচ্ছিক হস্তান্তর [Nafl Transfers]

১. প্রাকৃতিক বণ্টন পদ্ধতি [Natural distribution methods]

এটিকে উত্তরাধিকার বণ্টন বা উত্তরাধিকার হস্তান্তরও বলা হয়।

মানুষ মরণশীল। মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। এ বিষয়ে কুরআন বলছে,–

www.pathagar.com

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

প্রত্যেক জীবনকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (২৯ ঃ সূরা আনকাবূত ঃ ৫৭)

একজন মানুষের মৃত্যুতে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ যে নিয়মের নিগড়ে অন্যের অধিকারে আসে সেটাই আয় ও সম্পদ বণ্টনের প্রাকৃতিক বণ্টন ব্যবস্থা এবং তা হল ইসলামের মীরাসী আইন বা উত্তরাধিকার আইন [Law of Inheritance in Islam]। কুরআন ও হাদীসে নির্দেশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে উত্তরাধিকার আইন। যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে উত্তরাধিকার আইন সমাজের আয় ও সম্পদের বণ্টনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার আইন হল সম্পদের উপর ব্যক্তির মালিকানা অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা। কিন্তু এ উত্তরাধিকার আইন বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন রূপ হওয়ায় আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা ও বৈষম্যের উদ্ভব ঘটেছে।

কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় শুধু পুত্র সন্তানরাই মৃত ব্যক্তির সমুদয় ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় [প্রাক ইসলামী আরবে প্রচলিত ছিল]। ফলে নারীরা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার কোন কোন দেশে যেমন বৃটিশ উত্তরাধিকার আইনে Primogeniture বিধানে মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে শুধুমাত্র মৃতের সৌভাগ্যশালী জ্যেষ্ঠ সন্তান। ফলে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন দূরে থাক মৃতের কনিষ্ঠ ছেলেমেয়েরাও তার সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার কোন কোন সমাজে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সমুদয় সম্পত্তি উইল [Will] করে দেয়ার ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে। এ ধরনের ব্যবস্থায় মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি হকদারদের মধ্যে বণ্টিত না হয়ে বরং দু'একজনের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জিভূত হতে থাকে।[৫৭]

উল্লেখিত সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার আইনে অসম বণ্টন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করেই অর্থনীতিবিদ প্রফেসর টাসিগ ও ফিশার আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসমতার [Abnormal inequality] জন্য উত্তরাধিকার আইনকেই দায়ী করেছেন।[৫৮]

---

৫৭. ড. এ. এইচ. এম. সাদেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

৫৮. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ উদ্দিন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃ. ২৫৩।

www.pathagar.com

ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইন। এ আইনে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত ও পুঞ্জিভূত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ এ আইনে মৃতের নিকট ও দূরের সকল ওয়ারিশ তা যে কোন বয়সে হোক, যে কোন লিঙ্গের হোক– এমনকি মাতৃগর্ভে থাকলেও সে মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বলে গণ্য হবে। অন্যকথায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে বিপুল সংখ্যক উত্তরাধিকারীর দাবী স্বীকৃত। এ আইন মোতাবেক উত্তরাধিকারীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ১. অংশীদার, ২. রেসিডুয়ারি, ৩. দূর আত্মীয়।

সূরা আন নিসায় অংশীদারদের জন্য ৬টি ভগ্নাংশ তিন ভাগের দুই, দুই ভাগের এক, তিন ভাগের এক, চার ভাগের এক, ছয় ভাগের এক, আট ভাগের এক উল্লেখ করা হয়েছে।

ড. এ. এইচ. এম. সাদেক বলেন, ইসলামী অর্থনীতিতে উত্তরাধিকারের যথার্থ বণ্টনের নিশ্চয়তা রয়েছে। উত্তরাধিকার মৃত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে নৈকট্যের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। কে ছেলে আর কে মেয়ে, কে ছোট আর কে বড়, কে মৃত ব্যক্তির প্রিয় আর কে অপ্রিয়, এগুলো মাপকাঠি নয়। বরং আত্মীয়তার নৈকট্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার বণ্টিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে যায়, পুরুষ (অংশীদারগণ) তা থেকে অংশ পাবে, আর পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়রা যা রেখে যায়, মহিলা (অংশীদারগণ) তা থেকে অংশ পাবে, সে উত্তরাধিকার কম হোক আর বেশী হোক। এ হলো নির্ধারিত অংশ।"

কুরআন ও হাদীসে নিকট আত্মীয়দের অংশ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আছে। এতে পরিবর্তন করার কারো অধিকার নেই। এমনকি কোন উত্তরাধিকারীকে একটু বেশি সুবিধা দেয়ার জন্য উইল করার অনুমতি নেই। অন্য কারো জন্য উইল করতে হলেও তা এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক করা যাবে না। এসব বিধি নিষেধ এজন্য জারী করা হয়েছে, যাতে উত্তরাধিকারের সম্পদ কারো নিকট পুঁজিভূত হয়ে থাকতে না পারে।[৫৯]

---

৫৯. ড. এ. এইচ. এম. সাদেক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

www.pathagar.com

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ইসলামী মীরাসী আইনের কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১. শরীয়াহ্ নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের সম্পদ বণ্টিত হতে বাধ্য;

২. যোগ্যতা, বয়স, লিঙ্গ নির্বিশেষে মৃতের সকল ওয়ারিশগণই নৈকট্যের ভিত্তিতে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির কম বেশি অংশ পায়;

৩. কেউ তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক উইল (ওয়াসিয়াত) করতে পারবে না; উইল দাতব্য উদ্দেশ্যে হতে হবে অথবা এমন ব্যক্তিবর্গের জন্য হবে যারা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অংশীদার নয়;

৪. মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশের নিশ্চয়তা রয়েছে;

৫. মৃতের সম্পত্তিতে তার ভাই-বোনেরও অংশের নিশ্চয়তা রয়েছে;

৬. স্ত্রীর জন্যে একটি অংশ সংরক্ষিত থাকে;

৭. অবশিষ্ট অংশ মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্তুতিগণ পায়;

৮. পুত্র-কন্যা ও ভাই-বোন না থাকলেই কেবলমাত্র দূরবর্তী আত্মীয়গণ ওয়ারিশ হবে;

৯. ইসলামী মীরাসী আইনের বদৌলতে নাবালক, ইয়াতীম, দুঃস্থ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, মানসিক প্রতিবন্ধী প্রভৃতি যে কোন ধরনের মানুষই উত্তরাধিকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে তাৎক্ষণিক অসহায়ের সহায় সৃষ্টি হয়।

১০. কাফন, দাফন ও ঋণ-দেনা পরিশোধের পরই মৃতের বাকী সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টিত হবে।

১১. যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র হবে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী।

১২. সম্পদ বণ্টনের সময় ফকীর, মিসকীন ও সাহায্যপ্রার্থীদের সাধ্যমত সেবামূলক দান খয়রাত করা।

উপরের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে আয় ও সম্পদ সব সময় হস্তান্তরিত হচ্ছে। এক হাত হতে একাধিক হাতে পৌছানোর দরুন পুঁজিবাদের মত কতিপয় ব্যক্তির হাতে কিংবা কমিউনিজমের মত রাষ্ট্রের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ইসলামী মীরাসী আইনে। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, নিকট আত্মীয়-দূর আত্মীয়সহ গোটা সমাজের সকলেই এ আইনের দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

ইসলামে সম্পদের পুনর্বণ্টন ক্ষেত্রে বিয়েরও প্রভাব রয়েছে। ড. আনাস ঝারকা

www.pathagar.com

দেখিয়েছেন, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদের সহসম্বন্ধের সংগ যদি দুর্বল হয় তাহলে সম্পদ পুনর্বণ্টনের উপর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যদি ধনীরা ধনীদের মধ্যেই এবং গরীবরা গরীবদের মধ্যেই বিয়ে করে তাহলে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীত্বের প্রভাব হবে দুর্বল। কেননা এক্ষেত্রে উভয়ের সম্পদের সহসম্বন্ধে সংগ হবে খুব উঁচু।[৬০]

সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (Curative Methods)

সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি হল ঐ সমস্ত ম্যাকানিজম যা দ্বারা সম্পদশালী ব্যক্তির অতিরিক্ত আয় ও সম্পদের একটি অংশ অপেক্ষাকৃত কম সম্পদের অধিকারী বা সম্পদহীনদের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে অস্বাভাবিক অসমতা বহুলাংশে কমে যায়। আয় ও সম্পদ বণ্টনের সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরিত হয়।

ক. বাধ্যতামূলক হস্তান্তর (Compulsory Transfers)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টনের ইসলামী নীতি বাস্তবায়িত হলে সম্পদ বণ্টনে অবাঞ্ছিত বৈষম্য থাকতে পারে না। কিন্তু তথাপি উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের যোগ্যতা, প্রচেষ্টা এবং উত্তরাধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমে সম্পদ বণ্টন কিছুটা আপেক্ষিক বৈষম্য থাকা বৈচিত্র নয়। যেহেতু ইসলামী বণ্টন নীতি সমমুখী, সেহেতু এরূপ আপেক্ষিক পার্থক্য কমানোর জন্য বাধ্যতামূলক হস্থান্তরের বিধান রাখা হয়েছে। যেমন–

১. যাকাত ঃ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হচ্ছে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এটি ইসলামের বড় অর্থনৈতিক ইবাদত। নামায ও যাকাত সম্পূরক। একটি ছাড়া অপরটি কবুল হয় না। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক প্রতিষ্ঠান। ফিকাহ শাস্ত্রে যাকাতকে ইসলামের দ্বিতীয় ইবাদত বলা হয়েছে। সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করা হলে সম্পদের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেন। মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে সম্পদ বণ্টন তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতকে প্রতিষ্ঠা করেন। দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাত অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

সমাজে ধন-সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মহান উদ্দেশ্যেই ধনীদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। যাকাত দরিদ্র, অভাবী, দুঃস্থ এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

---

৬০. ড. আনাস ঝারকা, ইসলামিক ইকনমিকস ঃ এন এপ্রোচ টু হিউম্যান ওয়েলফেয়ার প্রবন্ধ ১৯৯২ গাজালী ও ওমর সম্পাদিত রিডিংস ইন দি কনসেপ্ট এণ্ড মেথডলজী অফ ইসলামিক ইকনমিকস, পিলানদুক পাবলিকেশন্স, মালয়েশিয়া, পৃ. ১৫১।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচন যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। মহানবী (সা) যাকাতের মাধ্যমে জনগণকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করনে ভূমিকা পালন করেছেন। যাকাত দরিদ্রকে প্রবৃদ্ধি দান করে। যাকাত নিছক কোন দান নয় যা প্রার্থী ও দরিদ্রকে দয়া করে দেয়া হয়; বরং যাকাত হচ্ছে ধনীর সম্পদে আল্লাহ্ পাক কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্রদের অধিকার। আল-কুরআনের সূরা আয যারিয়াতে বলা হয়েছে, বিত্তবানদের ধন মালে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার রয়েছে। (৫১ ঃ সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯)

যাকাত আদায়ের বিষয়টি যাকাত দাতার ইচ্ছার উপর আদৌ ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং প্রত্যেক বিত্তবান বা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকগণ যাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তাদের সর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে আসে, সে জন্য ইসলাম শুরু থেকেই উৎসাহিত করেছে। জনগণের মনোভঙ্গিকে মহানবী (সা) সেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। মহানবী (সা) যাকাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন।

মানুষের মধ্যে যোগ্যতার যে স্বাভাবিক তারতম্য রয়েছে তার জন্য মানুষের আহরিত রুজি রোজগারেও কিছুটা তারতম্য হয়। কম যোগ্যতার কারণে কিছু লোক স্বীয় উপার্জন দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণ করতে পারে না। তাছাড়া সমাজে স্বাভাবিক কারণে ইয়াতীম, বিধবা, বৃদ্ধ, রুগ্ন, পঙ্গু ও অক্ষম দুঃস্থ লোক রয়েছে যারা কিছুই উপার্জন করতে পারে না। ইসলাম এসব মানুষের অভাব বিমোচন ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যেই স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। যাকাত ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে চাহিদা বেড়ে যায়, দাম বাড়ে এবং মুনাফা সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। যাকাত দেয়ার যোগ্যতা যাদের আছে তারা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন পূর্বের চেয়ে বেশী হয়; যাকাত যাদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়েছে তারা সে অর্থ দিয়ে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে। সুতরাং বিনিয়োগকারীরা পূর্বে যে যাকাত দিয়েছিল সেই অর্থ পণ্যের দাম হয়ে আবার তাদের কাছেই ফিরে আসে। তাদের মুনাফার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেড়ে যায়। দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজনীয় কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেই দারিদ্র্য দূর হয় না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে যখন এর সুফল ন্যায্যভাবে দরিদ্রদের হাতে পৌঁছে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা, কর্মসূচী ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। যাকাত এমনি ধরনের এক অনন্য অর্থ ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

আল্লাহ্পাক যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বণ্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। বলা হয়েছে ঃ যাকাতের মাল সম্পদ তো গরীব (ফকীর), অভাবগ্রস্ত (মিসকীন), যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী (আমেলুন), যেসব লোককে সন্তুষ্ট করা দরকার তাদের জন্য (মুয়াল্লাফাতুল কুলুব), আর দাস মুক্তি দানে (ফির রিকাব) ও ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধে (আল গারিমীন) এবং আল্লাহর পথে (ফি সাবিলিল্লাহ্) ও নিঃস্ব পথিকদের (ইবনুস সাবিল) প্রয়োজন পূরণে ব্যয়িত হবে। এটি আল্লাহর তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ্ সব জানেন ও সব বোঝেন।[৬১]

এ আয়াতে বর্ণিত ৮টি খাতেই যদি যাকাতের অর্থ ব্যয়িত হয় তাহলে দারিদ্র্য ও অন্যান্য বহু আর্থসামাজিক সমস্যা নিরসন হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণার্থে যাকাত প্রদানে কোন বিত্তবান মুসলমান নিষ্ক্রিয় থাকলে ইসলামের মহান চেতনাই ব্যাহত হয়। যাকাত আরোপের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতীয় সম্পদকেই যাকাতের আওতাভুক্ত করা হয়েছে তথা দারিদ্র্য দূরীকরণার্থে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের ভূমিকা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এরই ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদের একটা অংশ প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সরাসরি দরিদ্রদের হাতে চলে যায়। এরই মাধ্যমে দরিদ্র অক্ষম অভাবগ্রস্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা যায়।[৬২] যাকাত দেয়ার উদ্দেশ্যই হল সমাজ থেকে অসাম্য দূর করা। এর ফলে একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আয়ের সুষম বণ্টন সম্ভব হয় এবং এর ফলে পরবর্তী সময়ে সঞ্চয়ের পরিমাণেরও বৃদ্ধি হয়। বর্তমান অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, দারিদ্র্য দূরীকরণের সাথে সাথে অধিকতর লোকের আয় বাড়ার প্রেক্ষিতে অর্থনীতির মোট সঞ্চয় ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

২. ওশর ঃ ওশর আরবী শব্দ, অর্থ দশমাংশ, দরিদ্র সাধারণের সাহায্যার্থে উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ নির্ধারণ করা। ইসলামী পরিভাষায় জমির ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। ওশর ফরয। আল্লাহ্ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা হালাল উপার্জন থেকে এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু বের করি তা থেকে ব্যয় কর। আর ব্যয় করতে গিয়ে খারাপ জিনিস দিতে ইচ্ছে করো না।[৬৩]

---

৬১. ৯ ঃ সূরা আত তাওবা ঃ ৬০।

৬২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, যাকাত এর প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রবন্ধ) দ্র. আল কুরআনে অর্থনীতি, প্রথম খণ্ড (১৯৯০) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৫৯৮।

৬৩. ২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭।

www.pathagar.com

জমির সব ধরনের উৎপন্নের উপরই ওশর ফরয। ওশর আদায়ের কারণ হচ্ছে জমির ফসল লাভ। ওশর আদায় করতে হবে প্রতিটি ফসল হতেই। অন্য কথায় যেসব জমিতে বছরে দু'টি বা তিনটি ফসল হবে সে ফসলের প্রত্যেকটি হতেই নিসাব পরিমাণ ফসল হলে ওশর আদায় করতে হবে। আদায়কৃত ওশর দারিদ্র্য বিমোচনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সা) এর সময় যাকাত প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ওশর আদায় করতেন। তবে কোন কোন সময় ওশর আদায়ের জন্য পৃথক কর্মকর্তাও নিয়োগ করা হত। এ ধরনের কর্মকর্তাকে সাহিবুল ওশর[৬৪] বলা হত।

৩. কাফফারাত ঃ কোন অবাঞ্ছিত কাজ বা পাপ কর্ম হয়ে গেলে সে পাপ স্খলনের জন্য যে কাজ করতে হয় তাকে কাফফারা বলে। পাপ ও দারিদ্রের মধ্যে কোন প্রকার সম্পর্ক না গড়েও কেউ পাপ করলে বাধ্যতামূলক দরিদ্র্যদের দান করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে,[৬৫] জিহার করলে[৬৬] শরয়ী ওজর ছাড়া রমযানের রোযা ভাঙ্গলে কাফফারা আদায় করতে হয়। কাফফারা আর্থিকভাবে আদায় করা হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়। কাফফারার মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে সম্পদ হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।

৪. ফিদিয়া ঃ যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় রোযা না রেখে রোযার বদলায় ফিদিয়া দেয়ার সুযোগ রয়েছে।[৬৭] একটি রোযার ফিদিয়া অর্ধ সা গম অথবা তার মূল্য। অর্ধ সা প্রায় দুই কেজি। এ পরিমাণ গম বা তার দাম কোন মিসকীনকে দান করলে ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়।[৬৮] এর মাধ্যমে দরিদ্রজনরাই উপকৃত হয়।

৫. মোহর ঃ বিবাহের জন্য স্বামী যে অর্থ স্ত্রীকে দান করে তাকে মোহর বলে।[৬৯] মোহর এমন সম্পদ যা বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। এটা

---

৬৪. ড. ইয়াসিন মাজহার সিদ্দকী, রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো, পৃ. ২৭৯।

৬৫. ওয়াদা ভঙ্গের কাফফারা আদায়ের বিধান বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আল মায়েদার ৮৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

৬৬. জিহারের কাফফারা আদায়ের বিধান সূরা আল মুজাদালার ২-৪নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

৬৭. সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৪।

৬৮. আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ।

৬৯. আল ওয়াসীত- ১/৮৮৯।

www.pathagar.com

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া সম্মাননা। ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক স্ত্রীকে এই সম্পদ পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। সাধারণভাবে দেনমোহরকে দান কিংবা প্রীতি উপহার হিসেবে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দেনমোহর কোন দান কিংবা উপহার নয়। বরং অপরিশোধিত দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায় বা ঋণ। পবিত্র কুরআনে স্ত্রীর দেনমোহর যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে স্বামীকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। স্বামীর সামর্থ এবং স্ত্রীর পারিবারিক মর্যাদা এবং সদগুণাবলীর ওপর ভিত্তি করে দেনমোহর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। মোহর স্ত্রীদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার। একজন বিবাহিতা নারী তার স্বামীর কাছ থেকে প্রথম ও প্রধান অধিকার হচ্ছে মোহর প্রাপ্তি। আল্লাহপাক সন্তোষসহকারে (ফরয মনে করে) মোহরানা আদায়ের জন্য তাকিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'এবং তোমরা যদি তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ মোহরানা দিয়ে থাক তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিও না।' (৪ ঃ সূরা আন নিসা ঃ ২০)

আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তোমরা নারীদের তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; তবে তারা মোহরের কিয়দংশ সন্তুষ্টচিত্তে ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে।[৭০] হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের, যাদের তুমি মোহর প্রদান করেছ[৭১]। ইসলামে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্ত্রীর মোহরানা তাকেই পরিশোধ কর। তার (স্ত্রীর) অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে। স্ত্রীর দেনমোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটি ঋণ। অন্যান্য ঋণ পরিশোধ যেরূপ জরুরী, দেনমোহরও তেমনি সন্তুষ্টিচিত্তে পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য। অনেক স্বামীর মধ্যে এরূপ প্রবণতা বিদ্যমান, স্ত্রীকে অসহায় মনে করে, চাপ প্রয়োগ কিংবা জোর-জবরদস্তি করে দেনমোহর মাফ করিয়ে নেয়া; যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

মোহরের অর্থ দরিদ্র, বিত্তহীন নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলাম নারীদের মোহরানার অধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করেছে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, 'হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী যদি নারীদের মোহরানা বিয়ের দিন অথবা বিয়ের কিছুদিন পর পূর্ণ মোহরানা বা আংশিকও পরিশোধ করা হয় তবে সে মোহরানাই হতে পারে নারীর জন্য সুদমুক্ত পুঁজি

---

৭০. সূরা আন নিসা ঃ ৪।

৭১. সূরা আল আহযাব ঃ ৫০।

www.pathagar.com

(interest free capital), যা বিনিয়োগ করে নারী তার পছন্দমত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে।

মোহরানার অর্থ বিনিয়োগ নারীকে ঋণের ঝুঁকি, সুদের অক্টোপাস, বেসরকারী সংস্থার নানা শর্ত থেকে মুক্ত রেখে লাভজনক সহায়তা করবে। বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা সে পরিবারসহ যে কোন কাঙ্খিত সামাজিক কাজে ব্যয় করে প্রশান্তি অনুভব করতে পারে। বস্তুতঃ মোহরানাই হতে পারে দরিদ্র নারীদের জন্য প্রথম সুদমুক্ত পুঁজি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করার প্রথম আর্থিক উৎস।

খ. ওয়াজিব হস্তান্তর [Wajib Transfers]

১. সাদাকাতুল ফিতর ঃ পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনার পর ঈদুল ফিতরের দিন বিত্তশালীদের উপর গরীব দুঃখী দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন, 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় না করা পর্যন্ত রোযাদার ব্যক্তির রোযা আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে, আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না। যাকাতের তুলনায় সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। কারণ যাকাতের তুলনায় ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত অনেকাংশে সহজ ও শিথিল। প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবার- পরিজন ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়।

সাদাকাতুল ফিতর প্রচলনের দুটি রহস্য ও কারণ রয়েছে। ১. সিয়ামে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করা। ২. সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ঈদের দিনের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা এবং দুঃখীদের ঈদের আনন্দে অংশীদার করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (সা) সিয়াম পালনকারীকে অর্থহীন ও অশ্লীল কথা-বার্তার ক্ষতি থেকে পবিত্র করার জন্য এবং গরীব-দুঃখী-অভাবীদের মুখে খাবার তুলে দেয়ার জন্য ফিতরার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে চালু করেছেন। সাদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মহানবী (সা) মদীনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে দরিদ্র ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

২. নাফাকাত ঃ ব্যয়, খরচ, মহার্ঘ্য ইত্যাদি অর্থে অভিধানে নাফাকা শব্দ ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হয়।[৭২] স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবাস, সন্তান লালন-পালন, পরিচর্যা ইত্যাদির নিমিত্ত যে অর্থ ইসলামের বিধান মোতাবেক বর্তায় তাকে শরীয়াতের পরিভাষায় 'নাফাকা' বলে।[৭৩] একজন নারীর ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার হচ্ছে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার। স্ত্রীকে খোরপোষ দেয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব। সূরা আন নিসার ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'পুরুষরা হচ্ছে নারীদের কাজকর্মের উপর প্রহরী (তত্ত্বাবধায়ক), কারণ আল্লাহ্ এদের একজনকে আরেকজনের উপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা প্রদান করেছেন, (পুরুষের এই মর্যাদার) একটি (বিশেষ) কারণ হচ্ছে পুরুষ তার জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।'

যে কোন অবস্থায় পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষদের। পুরুষদের কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়া নারীদের জন্য করুণা নয় বরং ন্যায্য অধিকার। স্বামীর বাড়িতে যাবার পূর্বে কন্যার জন্য তার পিতা যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। কোন নারী বিধবা হলে, তার নিজের সঙ্গতি না থাকলে তার বাবা এবং বাবার অবর্তমানে ভাই তার বোনের ব্যয়ভারের দায়িত্ব বহন করবে। অন্যকথায় নারীর যাবতীয় ব্যয়ভার এক বা অন্যভাবে স্বামী, বাবা ও ভাই অর্থাৎ পুরুষের কাঁধে দেয়া হয়েছে। নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর দিয়ে ইসলাম নারীকে ক্ষমতায়িত করেছে। যে কোন অবস্থায় পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষদের। পুরুষদের কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়া নারীদের জন্য করুণা নয় বরং ন্যায্য অধিকার। ন্যায্য ও উত্তমভাবে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা যাবে না। কুরআনে নাফাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে (তালাক প্রদত্ত নারী প্রসঙ্গে) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে বাস কর তাদেরও সেখানে বাস করতে দেবে, সংকটে ফেলার জন্য তাদের উত্যক্ত করবে না, তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দেয় তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা

৭২. আল মিসবাহুর মুনীর ৬১৮; আল ওয়াসীত-২/৯৪২-৯৪৩।

৭৩. আল ওয়াসীত-২/৯৪২।

www.pathagar.com

দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চাইতে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।[৭৪]

শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করা। পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা, স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ দিতে আইনত বাধ্য নন। আত্মীয়-স্বজন, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ প্রতিবেশীকেও এ আওতায় আনা হয়েছে। এমন কেউ কি আছে যার কোন গরীব আত্মীয় নেই। দারিদ্র্য দূরীকরণে নাফাকাত বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর পূর্তি করে খায় আর পার্শ্বে তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।'

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ 'মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দাহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক। আমি আপনাকে কি করে খাবার দিতাম আপনি যে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক? তিনি জবাবে বললেন, তুমি কি অবগত নও যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল কিন্তু তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে তখন খাবার দিতে তাহলে (আজ) আমার কাছে তা পেয়ে যেতে'। (মুসলিম)

স্বয়ং আল্লাহ যেখানে বুভুক্ষ মানুষের পক্ষে কথা বলবেন সেখানে এর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। জান্নাতে যাওয়ার জন্য যা করণীয় তার অন্যতম হচ্ছে বুভুক্ষকে খাদ্য দান। হাদীসে আছে, 'তোমরা দয়াময়ের ইবাদত করবে, (দরিদ্রকে) অন্ন দান করবে এবং সালামের প্রচলন করবে তাহলে স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

আল কুরআনে বলা হয়েছে, জাহান্নামের কঠোর শাস্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে অভাবীদের খাদ্য দান না করা। ইরশাদ হয়েছে ঃ "ধর একে, গলায় বেড়ী লাগিয়ে দাও। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে। (কারণ) নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবীদের খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না। (৬৯ ঃ সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৩০-৩৪)

৩. নজর [Najr] ঃ এর অর্থ নজরানা, মানত ইত্যাদি (৩ ঃ সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫) কোন মনোবাসনা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করা হয়। মানতের

---

৭৪. সূরা তালাক ঃ ৬-৭নং আয়াত।

www.pathagar.com

পরে মনোবাসনা পূর্ণ হলে ঐ মানত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মানতের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত গরীব দুঃখীরাই উপকৃত হয়। পবিত্র কুরআনে সৎকর্মশীলদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا -

(এরা হচ্ছে সে সব লোক) যারা 'মানত' পূর্ণ করে এবং এমন এক দিনকে ভয় করে, যে দিনের ধ্বংসলীলা হবে (ব্যাপক ও) সুদুর প্রসারী। (৭৬ঃ সূরা আদ দাহর ঃ ৭)

এ আয়াতে বলা হয়েছে সৎকর্মশীলরা যখন কোন কিছুর মানত করে তখন তারা এটা পূরণ করে। অর্থাৎ মানত করতেই হবে তা নয়। তবে যদি করা হয়, তা পূরণ করতে হবে।

৪. উদহিয়া [Udhiya] ঃ উদহিয়া হচ্ছে কুরবানী। কুরবানীর আভিধানিক অর্থ আত্মত্যাগ, অপরের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা। ইসলামের পরিভাষায়, আল্লাহকে নিজের জীবন ও ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক স্বীকার করে সে মহান মালিকের ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ গুলোকে তারই পথে ত্যাগ করার নিদর্শনস্বরূপ নির্দিষ্ট পন্থায় পশু যবেহ করার নামই হচ্ছে কুরবানী। কুরবানীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার। মানুষ যে যাবতীয় ধন সম্পদ ও নিয়ামতের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ, কুরবানী করে সে তারই নিদর্শন পেশ করে। কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যেও বন্টন করা যায়। কুরবানীর পশুর চামড়ার বিক্রিত অর্থ গরীব-দুঃখী, অভাবগ্রস্তদের মধ্যেই বণ্টিত হয়। ইয়াতিম অসহায়দের দান করা যায়। কিংবা গরীবদের শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসনের জন্য কেউ কোন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকলে তাতেও দান করা যায়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বর্তমানে হজ্জের সময় কুরবানীকৃত পশুর গোশত কোল্ড ষ্টোরেজে সংরক্ষণ করে পরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টনের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রেরণ করে থাকে।

৫. আকীকা [Aqiqah] ঃ সন্তান জন্মের পর সন্তানদের কল্যাণ কামনায় হালাল গৃহপালিত পশু যবেহ করাকে আকীকা বলে। আকীকার গোশত সন্তানদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনরা খেতে পারে। এ গোশত অভাবগ্রস্তদের মধ্যেও বণ্টন করা যায়। আকীকার পশুর চামড়া গরীব অভাবগ্রস্তদের দান করে দিতে হয়। এতে দরিদ্রজনরা উপকৃত হয়।

www.pathagar.com

গ. ঐচ্ছিক হস্তান্তর [Nafl Transfers]

সচ্ছল ব্যক্তিগণকে বার বার তাগিদ করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলদের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করার জন্য। মহানবী (সা) বলেন, তোমাদের সম্পদে মানুষের জন্য যাকাতের বাইরেও অধিকার রয়েছে। (তিরমিযী)

এখানেই ঐচ্ছিক হস্তান্তরের ম্যাকানিজমগুলো এসে পড়ে। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. সাদাকাতে নাফেলা (Sadaqat-E-Nafela) ঃ যদি কোন ধন সম্পদ বিনা প্রতিদানে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাউকে প্রদান করা হয় তাকে 'সাদাকাতে নাফেলা' বলে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের জন্য সাদাকাতকেই মহানবী (সা) 'আমলে খায়ের' বা সৎ কাজ বলে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ ধরনের সাদকাহর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তাকে ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৭৫] এ ধরনের সাদাকাহ বা দান সর্বোত্তম মানবীয় গুণ। মহানবী (সা) বলেছেন, তোমার কাছে থাকা একটি খেজুরের একাংশ হলেও দান কর। দান দরিদ্র ও নিঃস্বদের জীবনে স্বস্তি আনার সাথে সাথে দাতার জীবনেও আনে অফুরন্ত কল্যাণ। এ ধরনের দানের ফায়দা অনেক। যেমন–

১) দান উপার্জনকে শুদ্ধ করে।

২) দান পাপ মোচন ও অন্তরে তৃপ্তি দান করে।

৩) দান বালা-মুসিবত ও রোগ-ব্যাধি দূর করে।

৪) দান ভয়-পেরেশানি ও দুঃখ-কষ্ট দূর করে।

৫) দান দারিদ্র্যবিমোচন ও সম্পদে বরকত দান করে।

তবে যারা আসলেই অভাবী নয় এবং যারা স্বাস্থ্যবান ও শারিরীক দিক থেকে সক্ষম তাদের দান করাকে মহানবী (সা) অবৈধ ঘোষণা করেছেন।[৭৬]

২. হিবা (Hiba)ঃ যদি কোন সম্পত্তি কোন প্রতিদান গ্রহণ ব্যতিরেকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয় তাহলে তাকে হিবা বলে। হিবা দানের অন্যতম একটি প্রকার। হিবা জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি ভাল উপায়। মহানবী (সা) হিবার মাধ্যমে দান করা বৈধ বলে তা করতে উৎসাহিত করেছেন।[৭৭]

---

৭৫. ২ ঃ সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৭; ১৯৫; ২৫৪নং আয়াত; ৫১ ঃ সূরা আযযারিয়াত ঃ ৯; ৩০ : সূরা আর রূম ঃ ৩৮ আয়াত।

৭৬. আবু দাউদ, ভলিউম-১, ১৯৫২, পৃ. ৩৭৯

৭৭. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

৩. ওয়াকফ (Waqf) ঃ ওয়াকফ বা দাতব্য ট্রাস্টও ইসলামী অর্থনীতিতে আয় এবং সম্পদ পুনবন্টন স্কীমের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ওয়াকফ একটি আরবী শব্দ। কোন সম্পত্তি আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে ওয়াকফ বলে।

সাধারণতঃ ওয়াকফ (বহুবচনে আওকাফ) দ্বারা ইসলামে বিশ্বাসী কোন লোক কর্তৃক তার যে কোন সম্পত্তি ইসলামী আইন [Shariah] দ্বারা স্বীকৃত ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক অথবা দানের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করাকে বুঝায়।

সাধারণতঃ ওয়াকফ দ্বারা স্থায়ীভাবে দানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে বুঝায়।

ওয়াকফ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'প্রতিরোধ করা' বা 'বিরত রাখা' [Prevent or restrain] আরবী ভাষায় এর অর্থ অবরুদ্ধ রাখা অথবা আটক রাখা [Confinement or detention]।

ইসলামী শরীয়া মতে, ওয়াকফ হল এমন একটি কাজ যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এমন কোন সম্পদ ব্যবহার এবং হস্তান্তর থেকে বিরত থাকে যার দ্বারা যে কোন ব্যক্তি লাভবান হতে পারে অথবা যতদিন টিকে থাকে ততদিন এ সম্পদ অন্যের উপকারার্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

হানাফী মতে, ওয়াকফ এর অর্থ হচ্ছে যে কোন সম্পদের মালিকানা ত্যাগ করে তা স্থায়ীভাবে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করা এবং অন্যের কল্যাণে এ সম্পদ ব্যয় করা।

অন্যকথায়, ওয়াকফ হচ্ছে অন্যের উপকারের জন্য স্থায়ীভাবে যে কোন সম্পত্তি, যার দ্বারা অর্জিত আয় তার নির্দেশিত ইসলামী শরীয়াধীন কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যয় করা হয়।

ইসলামে ক্যাশ ওয়াকফও স্বীকৃত। অটোম্যান যুগেও এর ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবেও ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবহার করা যেতে পারে। ওয়াকফ করা একটি নফল ইবাদত। ব্যাপক হারে এর প্রচলন করতে মহানবী (সা) উৎসাহিত করেছেন। মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। হালাল উপায়ে অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে মিল্লাতে মুসলিমার কল্যাণের জন্য ওয়াকফ করে গেলে সদকায়ে জারিয়া রূপে তা মানুষকে অমর করে রাখে। সদকায়ে জারিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান হচ্ছে ওয়াকফ। মহানবী (সা) বলেছেন, ভাল কাজে ওয়াকফ সম্পত্তির আয় নিয়োজিত করতে হবে এবং এ ওয়াকফ মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের বেশী হবে না।[৭৮] যে সম্পত্তি আল্লাহর নামে

৭৮. বুখারী শরীফ।

www.pathagar.com

ওয়াকফ করা হবে তার আয় গরীব, মিসকীন, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, ইয়াতীম ইত্যাদির জন্য ব্যয় করতে হবে। ওয়াকফ এর মাধ্যমে মানুষ ফল লাভ করে যুগ যুগ ধরে।

ওয়াকফ এর মাধ্যমে

১) গরীবের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

২) গরীবের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

৩) বিত্তশালী ব্যক্তিও এক ধরনের সামাজিক শান্তি অনুভব করে।

৪) গরীব ও বিত্তশালীদের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে।

৫) একটি নতুন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় যেখানে একে অপরের আয়ের উপর আস্থাশীল হয়, সবাই পরস্পরে অপরের সহযোগিতা নিয়ে সমৃদ্ধ এক সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে।

৬) সমাজে ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হয়।

ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। ইসলামের ইতিহাসের শুরু হতেই মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে ওয়াকফ বিপুল অবদান রেখে আসছে।

৪. ওয়াসিয়াত (Wasiat) ঃ মৃত্যুর সময়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সাধারণভাবে স্বীয় সম্পদের একাংশ দান করে যাবার নাম ওয়াসিয়াত (উইল)।[৭৯] মহানবী (সা) সম্পদের তিন ভাগের একভাগ ওয়াসিয়াত করতে বলেন, এর বেশী নয়। অন্য কথায় ওয়াসিয়াত সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ করা যাবে। এক তৃতীয়াংশের বেশী ওয়াসিয়াত করলে, অতিরিক্ত অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। ওয়াসিয়াত এমন একটি আমল যদ্দারা বিত্তবানরা জীবনের শেষ মুহূর্তে সৎকাজ হিসেবে দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তকে আর্থিক উপকার করতে পারে। ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারীর পক্ষে কোন ওয়াসিয়াত করা যায় না এবং যারা উত্তরাধিকারী নন কেবল তাদের পক্ষে সম্পত্তির তিনের এক অংশ ওয়াসিয়াত করা যায়।

৫. জারাইর (Zarair) ঃ দরকার মত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাই

৭৯. তিরমিযী শরীফ।

www.pathagar.com

জারাইর। মহানবী (সা) এ ক্ষেত্রেও নিজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং সকলকে উৎসাহিত করেছেন।[৮০]

৬. মিনাহ্ (Minh) ঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ আর একটি ম্যাকানিজম হচ্ছে মিনাহ্। এ ম্যাকানিজম উৎপাদনমুখী কোন সম্পদ অভাবী দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়। মহানবী (সা) স্বয়ং এই ম্যাকানিজমের শুভ সূচনা করেন। মদীনার সামর্থ্যবান সাহাবারা মক্কা থেকে হিজরতকৃত মুহাজিরদেরকে এ পদ্ধতিতে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। মহানবী (সা) এর হাদীস থেকে অর্থ, ভারবাহী পশু, দুধেল পশু, কৃষি জমি, ফলের বাগান এবং বাড়ী এই ছয় ধরনের মিনাহ্ এর কথা জানা যায়।[৮১]

উপরোক্ত ম্যাকানিজমগুলো কার্যকরী করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে সম্পদ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়। যার ফলে দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদের মালিক হয়ে দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করে 'সাহেবে নেসাব' হতে পারে। ইসলাম এভাবে বাধ্যতামূলক, ওয়াজিব ও ঐচ্ছিক হস্তান্তরের মাধ্যমে সমাজে অর্থ ও সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। বলা বাহুল্য, সমকালীন অর্থনীতিতে এরূপ সম্পদ বণ্টনের কোন ব্যবস্থা নেই। এটি ইসলামী অর্থনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সরকারের নিকট হতে জনগণের নিকট হস্তান্তর

ইসলামী অর্থনীতিতে সকল অধিবাসীদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এজন্য বায়তুলমাল ছাড়াও যাকাত ফাণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত সংগ্রহ করে তা নির্দিষ্ট খাতে বণ্টন করে দেবে। এটি হলো একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা [Compulsory Social Security System]। পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে এরূপ কিছু ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা হলো ঐচ্ছিক এবং তা নির্ভর করে ক্ষমতাসীন দলের সম্পদ বণ্টনজনিত মূল্যবোধের উপর।

ইসলামী অর্থনীতিতে এ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। সরকার তা করতে বাধ্য। সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয়করণের প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ইসলামী রাষ্ট্র

---

৮০. ড. হাসান জামান, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (জুলাই ১৯৭৭) পৃ. ৪৬।

৮১. ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ, Islam, Poverty and Income Distribution, The Islamic Foundation (1991) p-44.

www.pathagar.com

মাসলাহাত বা মঙ্গলজনক মনে করলে শরীয়তে অনুমোদিত ব্যাপারেও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। এ ব্যাপারে ফকীহদের একটি শক্তিশালী অভিমত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয়করণের প্রমাণ মহানবী (সা) এর জীবদ্দশায়ও পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়ামন প্রদেশের মাআরিব নামক স্থানে অবস্থিত আবইয়াজ বিন হাম্মালের নিকট থেকে লবণের খনি জাতীয়করণ করেছিলেন।

উল্লেখিত দুটো বিষয় সামনে রেখে বলা যায় যে, জনগণের সুবিধা এবং সমমুখী বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র যদি প্রয়োজনীয় জাতীয়করণ করে, তবে তা শরীয়তের পরিপন্থী হবে না। বরং তা ইসলামী বণ্টন নীতির পরিপূরক শক্তি বলে বিবেচিত হবে।

শেষ কথা (Conclusion)

ইসলাম মানব কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমমুখী বণ্টন চায়। এ সমমুখী বণ্টন নীতি কার্যকরী করার জন্য ইসলামী অর্থনীতিতে উপযুক্ত পদ্ধতিও দেয়া হয়েছে। উৎপন্ন দ্রব্য যাতে উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে ঠিকভাবে বণ্টিত হতে পারে, তজ্জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বণ্টনের যথার্থ ব্যবস্থা আছে। এরপরও যদি কিছু আপেক্ষিক পার্থক্য থাকে, তা কমানোর জন্য হস্তান্তরজনিত বণ্টন নীতি রয়েছে। এছাড়া আছে প্রয়োজনে জাতীয়করণের ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে যেসব আচরণ বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়ক, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটি আদর্শ ইসলামী অর্থনীতিতে যদি এ বণ্টন নীতি সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়িত হয়, তবে সম্পদ বণ্টনে পুঁজিতান্ত্রিক বৈষম্য থাকতে পারে না। সেখানে সমমুখী বণ্টন ব্যবস্থাই বিরাজ করবে। আর এরূপ সমমুখী বণ্টন ব্যবস্থা দ্বারা মানুষের সার্বিক কল্যাণ বিধান করাই ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

www.pathagar.com

'আল্লাহ্ তোমাকে যে ধনসম্পদ দিয়েছেন, তার মাধ্যমে তুমি পরকালের ঘর তৈরিতে সচেষ্ট থাক। পৃথিবীতে তোমার অংশ গ্রহণ করতে ভুল কর না। তুমি অন্য মানুষের কল্যাণ কর, যেমনি আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করেছেন।'

(২৮ ঃ সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭)

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম একজন গবেষক, লেখক এবং ব্যাংকার। ১৯৫৯ সালে ঐতিহ্যবাহী লক্ষীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভবানীগঞ্জ হাইস্কুল ও লক্ষীপুর সরকারি কলেজ থেকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সাথে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রি লাভের পর ব্যাংকিং ও অধ্যাপনা পেশার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। পেশাগত জীবনে ব্যস্ততার মাঝেও তিনি একজন গবেষক, লেখক ও বিশ্লেষক হিসেবে বিশ্ব পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বাংলাদেশের অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং এবং ইসলামী দুনিয়া বিষয়ে নিয়মিত লিখছেন। অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মাসিক পৃথিবী, ছাত্র সংবাদ, কিশোর কণ্ঠে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি পাঠ্যবই লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা, ইসলামে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারণা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলার ইতিহাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, রমযানের চল্লিশ শিক্ষা, মহানবীর সচিবালয়, মহানবীর অর্থ প্রশাসন, ইলমুল হাদীস, ইসলামী আন্দোলনসহ অন্যান্য গ্রন্থাবলি শিক্ষার্থী ও সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক দু'টি বই প্রকাশের অপেক্ষায়। ছোটদের জন্যও তিনি নিয়মিত লিখছেন। ছোটদের ইসলামী অর্থনীতি, ছোটদের ইসলামী আন্দোলন, ছোটদের ইসলামী রাজনীতি প্রকাশনার কাজ চলছে। মাদরাসা ছাত্রদের জন্য তিনি বহু বই লিখেছেন, যা ছাত্র-শিক্ষক মহলে তাঁকে জনপ্রিয়তা দিয়েছে। একজন স্বতন্ত্র ধারার গবেষক ও প্রবন্ধকার হিসেবে ইতিমধ্যেই পাঠক মহলে তিনি তাঁর স্থান দৃঢ় করে নিয়েছেন।

তিনি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। ■

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার বাংলাবাজার কাটাবন

Ahsan Publication

9 847001 200036

www.ahsanpublication.com

www.pathagar.com